দেবকী বসুর 'কবি', ১৯৪৯ – একটি অটেকনিকাল পাঠ

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

দেবকী বসুর 'কবি' ফিল্মটার একটা সাবটাইটল বানালাম, এই ২০১০-এর পুজোর আগে পরে, ছুটির দিনগুলোয়, দিনে পনেরো ষোল ঘন্টা করে পরিশ্রম করে। আমার এক পুরনো ছাত্র জিগেশ করল, এত পরিশ্রম করলাম কেন? কী আছে সিনেমাটায়? সিনেমায় তো সিনেমাই থাকে, কিন্তু তা থেকে কী পাই, এটাই বোধহয় প্রশ্ন। 'কবি' থেকে আমি বহুকিছু পাই। যতবার দেখি, ততবারই পাই। 'কবি' উপন্যাস থেকেও পাই, কিন্তু 'কবি' ফিল্ম থেকে পাওয়াটা শুধু উপন্যাসনির্ভর পাওয়াটা নয়। তার চেয়েও বেশি কিছু কিনা নিশ্চিত নই, কিন্তু অন্যরকম তো বটেই। এবং বোধহয় কোনও কোনও জায়গায় 'কবি' ফিল্ম 'কবি' উপন্যাসকেও পেরিয়ে গেছে।

কবি আমি প্রথম পড়ি ক্লাস সিক্সে বা সেভেনে। হিন্দুস্কুলে পড়তাম আর মধ্যমগ্রামে বাড়ি, বাড়ির লোকেরা রমেশদা বলে একজনের সঙ্গে আমায় ফিরতে বলত। রমেশদা কাজ করত এস কে লাহিড়ি বলে একটা বইয়ের দোকানে। প্রেসিডেন্সির উল্টোদিকের ফুটে। 'কবি' উপন্যাসটা পড়েছিলাম ওখানে বসে। আরও অনেক বই আমি প্রথমবার পড়ি ওই এস কে লাহিড়িতে বসেই, 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', বা 'আরণ্যক'। দোকানে বসে বই পড়াটা, এখন আর কলকাতায় তেমন দেখি না, বিদেশে নাকি হয়, বা আমাদের বোম্বাই টোম্বাইয়ে। কিন্তু তখন কলকাতায় এটা বেশ চলত। শুধু রমেশদার সূত্রে ওই এস কে লাহিড়ি দোকানটাতেই নয়, আমাদের স্কুলের নিচু ক্লাসের ছেলেদের আক্রমণ বেজায় সহ্য করতে হত কলেজ স্ট্রিটের দাশগুপ্ত দোকানটাকেও। এটা সত্তরের দশকের একদম গোড়ার কথা বলছি। মানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংলাপে যে সময়টাকে বারবার 'সত্তর থেকে সাতাত্তর' বলে উল্লেখ করা হয়। দাশগুপ্তর ওই ভদ্রলোককে সেদিনও দেখলাম, হঠাৎ করে এক বন্ধুর সঙ্গে একটা বই কিনতে গিয়ে। খুব ইচ্ছে করল একটু কথা বলি, তারপর সঙ্কোচ হল। ওনার কাছে তো আমি ছিলাম অনেক বাচ্চার একজন, আমাকে আর মনে করতে পারবেন না। খুব বয়স্ক হয়ে গেছেন, কিন্তু টাক ছিল ওঁর সেই তরুণ বয়সেও, এবং মোটা কাঁচের চশমা, ভারি সুন্দর লাগত মুখটা সেই ক্লাস সিক্স সেভেন এইট বয়সে। হয়তো আরও ওই স্নেহপ্রবণতার কারণেই ভাল লাগত। একই সঙ্গে তিন জন চার জন ছেলে আমরা নাক ডুবিয়ে বই পড়ে যাচ্ছি কমিকস থেকে উপন্যাস, এরকম প্রায়ই ঘটত। বিশেষ করে কমিকস, ইংরিজি কমিকস কেনা তখন আমাদের মত নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে অচিন্তনীয় ছিল।

এস কে লাহিড়িতে বসে 'কবি' উপন্যাসটা পড়ার মুহূর্তটা আমার আজও মনে আছে। উঁচু টুলে বসে পড়ে যাচ্ছি, ডানদিকে কাউন্টারে কাত হয়ে, বইয়ের আলমারিতে হেলান দিয়ে। বসনের ঝুমুর নাচের যৌনতাটা আমি অনুভব করছিলাম, উত্তেজনাও হচ্ছিল একটা, একটু আশঙ্কাও হয়ত, অন্য কারুর চোখে পড়ে যাচ্ছে না তো। কিছু শব্দও ছিল, সেই অর্থে যা দেখলেই নিষিদ্ধ শব্দ মনে হয়, অন্ততঃ সেই কলকাতায় হত, যেমন 'উলঙ্গবাহার শাড়ী'। সেটা আমায় সচেতন করে দিয়েছিল, মনে আছে, অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না তো, আমি কী পড়ছি। চোখে ছটা লাগিল তোমার আয়না বসা চুড়িতে – এই গানটাও একটা অন্য রকম উচ্ছাস দিয়েছিল, মনে আছে। আমি এখনও যেন ওই বইটা ওই পাতাটা ওই লাইনগুলো দেখতে পাই। এটা ভয়ানক ভাবে আছে 'আরণ্যক' উপন্যাসেও। ওই কালোর উপর সবুজ সাদা গাছের প্রচ্ছদ, লবটুলিয়া বইহার নাড়া বইহার, সত্যচরণের মেস – এই গোটা স্মৃতিটাই যেন আলাদা করে উপন্যাসের স্মৃতি নয়, ঢুকে আছে ওই এস কে লাহিড়ি, তার সারি সারি কালচে সবুজ আলমারি, তার উঁচু টুল এইসবের মধ্যে। 'আরণ্যক' মনে পড়লেই ওটা মাথায় এসে যায়।

যাকগে। বুড়ো বয়সের এইসব বাহুল্য ছেড়ে 'কবি'-র কথায় ফেরা যাক। 'কবি' ফিল্মটায়, আমার যা লাগে,

উপন্যাসের একটা বিরাট গতিবিজ্ঞানই সম্পূর্ণ এসেছে, এবং হয়ত বাড়তি কিছুও এসেছে। সেই জায়গাটা আমি ঠিক কী পাই, সেটা দেখানোর জন্যেই এই লেখাটা। এবং এই অভিধায় এই 'অটেকনিকাল' শব্দটা লাগানো একদমই আত্মসম্মান বাঁচানোর তাগিদে। দিন চারেক আগে লেখাটায় হাত দিলে, বোধহয়, শব্দটা থাকত না। যদিও 'অটেকনিকাল' শব্দটা ব্যবহার করে আমার আগেও প্রবন্ধ আছে, এবং একই নাম বারবার ব্যবহারের একটা অভ্যাস আছে আমার। একই 'মনোজ' বা 'ত্রিদিব' নামও ব্যবহার করে গেছি আমার গল্পের পর গল্পে, বা উপন্যাসে, বারবার। ওই অভ্যাসেই হয়ত, নাম দিতাম 'দেবকী বসুর কবি – একটি পাঠ', ঠিক অমনই নামে, 'নওলপুরার বাঘ: বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর 'বাঘ বাহাদুর' – একটা পাঠ' নামে প্রবন্ধ লিখেছিলাম 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায়, আজ থেকে একুশ বা বাইশ বছর আগে। কী লিখেছিলাম তাও ভাল মনে নেই। এই লেখাটার নামে 'অটেকনিকাল' শব্দটা গুঁজে দিতে হল অনিন্দ্যর গুঁতোয়। সেই গল্পটা বলে নিই আগে।

অনিন্দ্য (সেনগুপ্ত) আর ওর বৌ সেঁজুতি (দত্ত), মানে এখন বিয়েটা হচ্ছে, যতদিনে লেখাটা আপনারা পড়বেন, ততদিনে বৌ হয়েই যাবে, এসেছিল এই 'কবি' ফিল্মের সাবটাইটল, নোটস আর ফিল্মটা নিতে। অনিন্দ্য চলচ্চিত্রবিদ্যা পড়ায় যাদবপুরে। সেদিন আমরা তিনজনে একবার সাবটাইটল সহ 'কবি' দেখছিলাম। একটা জায়গায় একটা দীর্ঘ নাচের দৃশ্য আছে। কথা নেই গান নেই, শুধু নীলিমা দাশের নেচে চলা। বেশ দীর্ঘ একটা দৃশ্য, তিরিশ সেকেন্ড জুড়ে, ১ ঘন্টা ৪ মিনিট ১৪ সেকেন্ড থেকে ১ ঘন্টা ৪ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। বারবারই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে আমার লাগে কী একটা বাড়তি চাপ দৃশ্যটায় আসছে, আমায় খুব টানে দৃশ্যটা। সেদিন দেখতে দেখতে ওদেরও বললাম এই টানার ব্যাপারটা। অনিন্দ্য দৃশ্যটা দেখার পরে বলল, কেন তোমায় টানে বলো তো, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। ও ফিরিয়ে নিয়ে গেল দৃশ্যটার মাঝামাঝির একটু আগে। বলল এই দেখো এখানে একটা ফাঁকা জায়গা, জায়গাটা ফাঁকা রাখা হয়েছে ওখানে এসে অনুভা গুপ্তা দাঁড়াবে বলে, ক্যামেরা যেন পূর্বানুমান করছে। এবং দেখো যেই এসে দাঁড়াচ্ছে, তার দৃষ্টিকে ধরে ক্যামেরা ফেরত আসছে নীলিমা দাশে। অর্থাৎ, এই দুই নারীর আবেগের টানাপোড়েনটা দৃশ্যে ঢুকে আসছে। এরকম আরও কিছু সেঁজুতিও বলল। এবং দেখলাম, একদম ঠিকই তো, মোক্ষম সব জিনিস বলছে। একদম ঠিক।

কিন্তু ওরা চলে যাওয়ার পরে মেজাজ বেশ খিঁচড়ে গেল। ওরা সব পুঁচকে ছেলেমেয়ে। তারা বুঝছে, অথচ আমি বুঝতে পারছি না, কী কাণ্ড। একবার ভাবলাম, লিখব না আর লেখাটা। তারপরে আর একটা সমস্যাও ছিল। বাংলায় লিখব, না ইংরিজিতে? আমি যা লিখতে যাচ্ছি তা বাংলা-দর্শকদের তো এমনিতেই মাথায় আসবে। কিন্তু অন্য ভাষার লোকদের আসবে না। আবার মনে হল, বাংলায় দেখা লোকদের একটা আবেগ তৈরি হবে ফিল্মটা দেখে, আর একটু খতিয়ে দেখার ইচ্ছেও জাগবে। এর মধ্যে গুরুচণ্ডালী সাইটের ঈপ্সিতা আমায় চিঠি দিল – একটা লেখা লেখো না। সঙ্গে পেদ্রো আলমোদোভারের দুটো ছবির উল্লেখ, যেগুলো আবার অনেক দিন আগে আমিই ওকে পাঠিয়েছিলাম, ওগুলো নিয়ে লিখতে বলেছিলাম। সেটা আমাকেই ফেরত পাঠাল। বলল, তুমি লেখো। তখন ওকে লিখলাম, তুই জানিস না, আমি একটু ঘেঁটে গেছি এই বাচ্চাদের সঙ্গে আমার ফিল্ম বোঝার পার্থক্যটা এমন বিচ্ছিরি ভাবে আবিষ্কার করে। 'কবি' নিয়ে লেখাটা আর আদৌ লিখব কিনা তাই ভাবছি। এত এত ফিল্ম দেখি আমি, গুষ্টি গুষ্টি, দিনরাত, তারপরেও এইটুকু বুঝতে পারিনা। ওরা কী সুন্দর টকাটক সব বুঝে ফেলল। তারপর, ঈপ্সিতাকে চিঠিটা লিখেই মনে হল, নাঃ, লেখাটা লিখেই ফেলি।

তাই প্রথম থেকেই এটা বুঝে নিন, এটা কোনও ফিল্ম-সমঝদার লোকের লেখা নয়। আমি প্রচুর ফিল্ম দেখি, সেগুলো দেখতে দেখতে কোনও কোনওটা আমায় প্রচণ্ড টানে, কোনও কোনওটা টানে না। যেটা টানে সেটা কেন টানে তা আমি বোঝার চেষ্টা করি নিজেই। এই লেখাটা সেই চেষ্টারই একটা লিখিত রূপ। প্রত্যেক লেখাই লেখা হয় একটা বা কয়েকটা মুখকে কপালের মধ্যে রেখে। এটায় সেই মুখটা আমার ওই

পুরনো ছাত্রের, যেন তাকে আমি এটা বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলছি। আর আমার ফিল্ম বোঝার দৃষ্টান্ত তো আগেই দিলাম, কোনও চলচ্চিত্রবোধের আশা করলে এই লেখাটা পড়বেন না। আমি রাজনীতি, আর তার সূত্রে রাজনৈতিক অর্থনীতি, নিয়ে খুব মাথা ঘামাই। ওটা একটা অসুখের মত। কিছুতেই না-ভেবে পারিনা। যে কোনও গরুই, শেষ অব্দি, আমার হাতে পড়লে এসে হাজির হয় ওই শ্মশানেই। এটা শুধু যে আমার কাজের জায়গা তাই নয়, এটা সত্যিই কোথাও একটা আমার নিজের কাছে নিজের অর্থ খোঁজারও একটা পরিসর। গল্প উপন্যাস লিখি আমায় সেগুলো পায় বলে, একটা ভরগ্রস্ততার চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করার দায় থাকে, আর একটা থাকে মাথায় থাকা কিছু সন্নিবিষ্ট আধা-এলোমেলো আবেগ-অনুভূতি-চিন্তার শেষ অব্দি লিপিবদ্ধ আকারটা কী দাঁড়ায় এটা খুঁজে পাওয়ার একটা উল্লাস বা আরাম। আবার বহু বছর ধরে এই গল্প উপন্যাস আখ্যানগুলো লিখতে লিখতে এই সাহিত্য-জীবন-বাস্তবতা এই ভাবনাগুলোও মাথায় এক ভাবে বিন্যস্ত হয়ে গেছে। তারও কিছু উপাদান উত্তেজিত হয়ে পড়ে 'কবি' ফিল্মটা দেখতে দেখতে, নিতাইয়ের জীবন আর তার সাহিত্যরচনা, মানে তার কবিয়াল গানগুলি বা ওই কাঠামোতেই তাৎক্ষণিক ভাবে রচনা করে তোলা ছড়াগুলো – এই দুয়ের ভিতরকার কিছু অতিনিয়ন্ত্রণ বা পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক, এটাও মাথায় চলে আসে। তারাশঙ্করের উপন্যাসটায় এটা রয়েছে আরও অব্যর্থ রকমে, কিন্তু 'কবি' ফিল্মেও যতটুকু এসেছে সেটাও বিরাট। সেই ভাবনাগুলোও কিছু চলে আসবে এই লেখাটায়।

যে সব হাতে গোনা বইয়ের উল্লেখ আসবে আলোচনার সূত্রে, সেগুলো লেখার মধ্যে মধ্যেই দেব। আর খুব আসবে ওই সাবটাইটল আর নোটসের কথা, এখনও যা মনে হচ্ছে। আমার ব্লগে (http://ddts.randomink.org/blog/?=153) সবকটা সাবটাইটল ফাইল আর নোটস ফাইলই পেয়ে যাবেন। ফিল্মটা এমনিতে ভিসিডিতে পাওয়া যায়, দেখবেন তার নামঠিকানা দেওয়া আছে ওখানে। আর কারাগার্গা (http://karagarga.net) এবং বাংলা-টরেন্টস (http://www.banglatorrents.com) এই দুটো টরেন্ট সাইটেও সেই এভিআই-গুলো আছে যার সঙ্গে এই সাবটাইটল ম্যাচ করে। কোনও ভাবেই যদি না পান, আমায় (dipankard@gmail.com) ঠিকানায় মেল করুন, কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

যাই হোক ফেরত আসা যাক 'কবি' ফিল্মের প্রসঙ্গে। মজার কথা এই যে, 'কবি' ফিল্মের সঙ্গে আমার মোলাকাত খুব বেশি দিনের নয়। হেমোপমদা (দস্তিদার) জয়পুরিয়া কলেজের মাস্টারমশাই ছিলেন, অবসর নিয়েছিলেন আমি যোগ দেওয়ার সামান্য দিন পরেই, যদিও মজার কথা, আজ পর্যন্ত কলেজ সূত্রে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা যার সাথে হয়েছে আমার, সে ওই হেমোপমদাই। হেমোপমদা প্রথম যেবার আমার বাড়ি আসেন, অন্তত তেরো চোদ্দ বছর আগে, আমাকে একটা ক্যাসেট দেন। সেটা ওই 'কবি' ফিল্মের সম্পাদিত সাউন্ডট্রাক, বা, কোনও শ্রুতিনাটক, ওই চিত্রনাট্যের উপর ভিত্তি করে, ওই একই শিল্পীদের দিয়ে। ঠিক কোনটা তা আমি নিশ্চিত নই। ক্যাসেটটা কালের গর্ভে হজম হয়ে গেছে তাও আজ বহুকাল, এমনকি সেই ক্যাসেট প্লেয়ারও। কোনও ক্যাসেট প্লেয়ারই নেই ঘরে তাও আজ বছর বারো তো বটেই। কম্পিউটার আসার থেকেই, যা হয়, সবই কম্পিউটার-নির্ভর হয়ে গেছে।

কিন্তু যা হজম হয়নি তা হল নীলিমা দাসের ওই বসনের চরিত্রের শ্রুতি-অভিনয়। বাপরে বাপ। কী দম আটকানো লাগত, "কেন করব আমি গোবিন্দের নাম, সে কী দিয়েছে আমায়?" এতটাই চাপ তৈরি করত যে আমি বারবার শুনতেও পারতাম না। মধুর ভান্ডারকরের 'চাঁদনী বার' বা বার্গম্যানের 'ভার্জিন স্প্রিং' ফিল্মে যেমন হয়েছিল আমার, কিছুতেই একবারে পুরোটা দেখতে পারতাম না। বা আরও অনেক কিছুতেই হয়েছে, ওই দুটোর নামই মাথায় এল এই মুহূর্তে। তারপর মাঝে মাঝেই ভাবতাম নীলিমা দাশের সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলে হয়। আমার এক বন্ধু বেলঘরিয়ায় নাটক করে, ওকে দিয়ে ওনার নাম-ঠিকানা যোগাড়ও করলাম, তারপর যাব যাব করতাম, সঙ্কোচও হত, কী বলব, নাটক অভিনয় এসবের কিছুই তো জানিনা, কী বলব গিয়ে। তারপর একদিন জানলাম, নীলিমা দাশ মারাই গেছেন। এরকম আমার আরও বেশ কয়েকবার হয়েছে।

এরপর হঠাৎ করে, গত বছরে মানু একদিন পুজোর ঠিক আগে আগে আমায় এনে দিল, 'কবি' ফিল্মের জোড়া ভিসিডির কালেক্টর এডিশন, এঞ্জেল ভিডিও-র। কী ছাইয়ের কালেক্টর এডিশন, ভাগ্যিস প্রথমেই এমপ্লেয়ার দিয়ে স্ট্রিম-ডাম্পটা নিয়ে নিয়েছিলাম হার্ড ডিস্কে, এই সাবটাইটল করাকালীন একদিন বার করে দেখলাম, সেই একবার চালানোতেই, এই এক বছরেই সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। তা যাক, যা বলছিলাম, ডাম্পটা চালানোর আগেই আমার গা শিরশির করছিল, চালানোর পরে আমি সত্য অর্থেই নেশাগ্রস্ত হয়ে গেলাম। প্রচুর জায়গার অডিও খুব খারাপ, যেমন ভিসিডি-গুলোয় প্রায়ই হয়ে থাকে। হার্ডডিস্কে থাকায় যতবার খুশি চালিয়ে চালিয়ে উদ্ধার করতে পেরেছি পরে। কিন্তু সেসব সমস্যা নিয়েই আমার উপর যেন ভর হল 'কবি' ফিল্মটার। তখন থেকেই সাবটাইটল করব ভেবেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই সময় পাচ্ছিলাম না। আমার শেষ বইটা, কম্পিউটিং ও সফটওয়ার জগতের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে, আগেই তো বলেছি ওটা আমার স্থায়ী শ্মশান, কিছুতেই শেষ হতে চাইছিল না। শেষ হল এসে অগাস্টের শেষ দিকে। সেপ্টেম্বরেই হাত দিলাম সাবটাইটলে। প্রচণ্ড সময় লাগছিল। একটা আলগা হিসাবে দেখেছিলাম, গড়ে প্রতি মিনিট ফিল্ম-সময়ের জন্য আমার শ্রম লাগছে তিন ঘন্টারও বেশি। এবার দুই ঘন্টা পাঁচ মিনিট ফিল্মে মোট শ্রমের পরিমাণটা ভাবুন। তাই পুজোর ছুটি পড়বার মুহূর্ত থেকে একদম ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। পুজোর দিন দশেক ষোল সতরো আঠারো ঘন্টা কাজ করে সমাপ্ত করেছি ওটা।

কিন্তু অত শ্রম করেও একটা অদ্ভুত আরাম হয়েছে। বোরহেস যেমন লিখেছিলেন, কাফকার সূত্রেই বোধহয়, আমাদের পিতা আমরা নিজেরাই নির্বাচন করি। আমাদের ঐতিহ্য কী তা খুঁজে নেওয়া আমাদেরই হাতে। 'কবি' ফিল্মটা যে সেই ঐতিহ্যের একটা খুব জোরালো জ্যান্ত জায়গা এই নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তাই বরং এটা আমার কাছে ছিল একটা সুযোগ, সম্মান জানানোর। দেবকী বসু মরে ফৌত হয়ে গেছেন, বোধহয় সমস্ত শিল্পীরাও তাই, তারাশঙ্কর তো বটেই। তাই তাদের আর কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই এতে, কিন্তু আমার আছে, আমি তো এখনও মরে যাইনি। এই সাবটাইটল করে, বা তারপরে, আমার এই লেখায় যদি 'কবি' ফিল্মটা দশটা বাড়তি লোকের কাছেও পৌঁছয়, আমার বেশ একটা আরাম হয় তাতে, যাক, কিছু একটা করলাম, এইরকম বিরাট একটা কাজের একটা হোর্ডিং লেখার তো সুযোগ পেলাম। কলেজের মাস্টারমশাইরা তো আজকাল শেয়ার বা গাড়ি/কোটের ব্রান্ড ছাড়া কিছু বোঝে না, লেখাপড়ার কাজ তো বহু আগেই পুরনো দিনের প্রাচীন কুসংস্কারের মত লুপ্ত হয়ে গেছে। যা টিকে আছে তা কিছু ব্যক্তি মানুষের আত্মরতিরত পাগলামিতে। ঠিক সেই মন্তব্যটাই করেছিলেন আমার এক সহকর্মী, আমার বৌয়ের কাছে, "কী, ওই সেই পাগলামি চালিয়ে যাচ্ছে তো, এই কাজে মালকড়ি তো কিছুই হবে না।" বিশ্বাস করুন, আমি একটুও নাটকীয় করছি না, ওই 'মালকড়ি' শব্দটাই তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

সত্যিই 'কবি' ফিল্মটা আমার বিরাট একটা কিছু লেগেছে। তুলসী চক্রবর্তীর অলৌকিক ওই অভিনয় নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই, সবসময়ই তিনি ওইরকম অভিনয়ই করে এসেছেন। কিন্তু, তার চোখের মুদ্রায়, কদর্য নাচের ভঙ্গীতে, যে ভাবে উঁচু জাতের দম্ভ এবং হিংস্রতাটা এসেছে, সেটা বোধহয় তুলসী চক্রবর্তীর পক্ষেই সম্ভব। নীলিমা দাশের কথা আগেই বললাম। অনুভা গুপ্তা, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, হরিধন, এদের সকলেরই অভিনয়, সঙ্গে রবীন মজুমদারের গান, এবং অনিল বাগচীর সঙ্গীত পরিচালনা, এর একটাও যদি সঠিক মানে না-পৌঁছত, 'কবি' বোধহয় তার নিজের জায়গায় পৌঁছতে পারত না। নৃত্য পরিচালকের নাম দেখলাম প্রহ্লাদ দাস। তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই আমি জানি না, কিন্তু প্রত্যেক বারই তুলসী চক্রবর্তীর ওই বিকট নাচ দেখতে দেখতে আমার নৃত্যপরিচালকের কথা মাথায় আসে। একজন পঞ্চাশোর্ধ ভারি চেহারার মানুষের শরীরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ওই নাচের ভঙ্গীর উদ্ভাবন তো সহজ কাজ ছিল না। এই রকম অজস্র টুকরো টুকরো কথা মাথায় আসে আমার। আক্ষরিক অর্থেই এগিয়ে পিছিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে 'কবি' ফিল্ম আমি অজস্রবার দেখেছি। আপনারা দেখুন, আমার প্রতিক্রিয়া যদি আপনাদের প্রতিক্রিয়ায় স্থানান্তরিত হতে পারে, সেটাই এই কাজের সাফল্য।

এবার ফিল্ম নিয়ে কথা শুরু করব আমরা। ব্যাপারটা সবচেয়ে সরল, একরেখ, এবং কম পরিশ্রমসাধ্য করার স্বার্থে, আমি ফিল্মটার সঙ্গে সঙ্গে এগোব, এবং ব্যবহার করে চলব আমার ওই সাবটাইটল ফাইল থেকে উদ্ধৃতি। এতে সময়রেখাটাও স্পষ্ট থাকবে, এবং দরকার মত আপনারা সঙ্গের নোটস ফাইলও পড়ে নিতে পারবেন। আগেই আমার ব্লগের ঠিকানা দিয়েছি, যেখান থেকে আপনারা ওই সাবটাইটল ফাইল দুটো, kabi-1.srt এবং kabi-2.srt, আর তার সঙ্গে পড়ার নোটসগুলো, kabi-1.notes.pdf এবং kabi-2.notes.pdf নামিয়ে নিতে পারবেন। সাবটাইটল ফাইলগুলো হল সরল টেক্সট ফাইল, যে কোনও প্লেইন টেক্সট এডিটরে খুলতে পারবেন, আর পিডিএফের জন্য কোনও একটা পিডিএফ রিডার লাগবে। দেবাশিস (দাস), আমার যে ছাত্রের কথা আগেই বলেছি, তার সঙ্গে বসেই যেন আমি আবার দেখছি ফিল্মটা, এবং মাঝেমাঝেই থামিয়ে কিছু কথা বলে নিচ্ছি। কথার শুরুতেই থাকছে সাবটাইটল ফাইল থেকে উদ্ধৃতি, পুরো সেই এন্ট্রি বা নথীটাই, প্রথমে সাবটাইটলের ক্রমিক সংখ্যা, তারপর সময়রেখা, তারপর পর্দায় দৃশ্য লেখাটুকু। এটুকু ইংরিজিতে। তার নিচে বাংলায় আমাদের আলোচনা। এবং, যেমন বলেছি, ফিল্মবিদ্যাগত ভাবে লেখাটা হতে যাচ্ছে সম্পূর্ণ অটেকনিকাল এবং অশিক্ষিত, কারণ আমিই তাই। আর আমার ছাত্রদের সঙ্গে আমি যে ভাবে কথা বলি, যা মাথায় আসে তাই কোনও একটা সম্পর্কিত রকমে বলে যাই, একটা অ্যাকাডেমিক লেখায় যে দায়িত্বপালনটা অন্তঃশীলা থাকে সেটার আদৌ পরোয়া না করে, এই লেখাটাও হতে যাচ্ছে তাই। আমার এক ছাত্রের সঙ্গে আমার কথা বলে চলা। আমি কেন 'কবি' ফিল্মে উত্তেজিত হয়েছি সেটাই তাকে আমি পৌঁছে দিতে চাইছি, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বুঝে উঠতে চাইছি। আর সবাই জানে মাস্টারমশাইরা একটু বক্তিয়ার খিলজি হয়, তাই কিছু অতিকথনও থাকতেই পারে। লেখার সঙ্গে একটু একটু নুন লাগিয়ে পড়বেন। সেই অর্থে এটা কোনও গম্ভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ লেখাই নয়, একবার সিনেমাটা চালিয়ে চালিয়ে দেখছি সেই ছাত্র আর আমি, এবং দেখাকালীন ফিল্ম থামিয়ে যা মাথায় আসছে, যতটুকু মাথায় আসছে বলে যাচ্ছি। এমনকি কোথায় কোথায় থামাচ্ছি তাও খুব নির্দিষ্ট কিছু নয়। অন্য আর এক বার দেখাকালীন হয়ত অন্য আরও কোথাও থামতাম।

শুরু করা যাক প্রথম সাবটাইটল ফাইল kabi-1.srt থেকে। একদম উপরে নম্বরটা হল সাবটাইটল ফাইলের এটা কত নম্বর এন্ট্রি, তারপর সময়রেখা, ঠিক কোন জায়গায় সাবটাইটলটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, আর একদম নিচে কী ফুটিয়ে তুলতে হবে। যার সঙ্গে দেখুন একটা নম্বরও দেওয়া আছে, নোটস ফাইলে এটা কত নম্বর নোটস।

8
00:02:32,990 --> 00:02:35,789
((Train whistle))[01]

ফিল্মটার সাবটাইটল দেখে আমার এক বন্ধু জিগেশ করেছিলেন, এরকম গর্দভের মত আমি ট্রেনের ভোঁ-টাও চিহ্নিত করে দিয়েছি কেন। আসলে স্ট্রেস মানেই তো ওভারস্ট্রেস। চিহ্নিত করে দেওয়া মানেই অবশিষ্টের থেকে পৃথক একটা সত্তায় জেগে ওঠা। কিন্তু চিহ্নিত করতে খুব বেশি করেই চেয়েছিলাম, এতে কোনও সন্দেহ নেই। নোটসেও যেমন লিখেছি, ট্রেন এবং রেলওয়ে এক কথায় বললে ব্রিটিশ আমলে বাংলায় তথা ভারতে সামাজিক গতিবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় প্রতীক। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে, শরৎ সমিতি সংস্করণের গ্রন্থপরিচয় অনুযায়ী। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪২-এ, কিন্তু তার আগে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায়, ১৯৩৮ থেকে, মিত্র ও ঘোষ সংস্করণের গ্রন্থপরিচয় অনুযায়ী। এবং পরে আমরা যেমন দেখব, 'কবি' উপন্যাসের তথা ফিল্মের ঘটনাগুলি ঘটছে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে, তার মানে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে। তার মানে, 'শ্রীকান্ত' আর 'কবি' এই দুই উপন্যাসই প্রকাশকাল অনুযায়ী যথেষ্ট নিকট। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের এগার অধ্যায় থেকে রেলওয়ে বিষয়ে একটু পড়া যাক।

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে না জানিয়ে বক্রেশ্বর তীর্থদর্শনে চলে যাওয়ায় অভিমানী শ্রীকান্ত বাড়তি উৎসাহে বেরিয়ে পড়ে তার বন্ধু সতীশ ভরদ্বাজ অসুস্থ জেনে। সতীশ রেলওয়ের কন্সট্রাকশন ইনচার্জ। তার ক্যাম্পে গিয়ে কলেরাক্রান্ত সতীশের শুশ্রূষা তথা তার প্রেম ও মৃত্যুর উপাখ্যান ভারি জমকালো, সেই বিষয়ে আর যাচ্ছি না। সতীশ এবং সেই ক্যাম্পের আরও অনেকের মৃত্যুর পর, সতীশের "অমর কীর্তি তাড়ির দোকান অক্ষয়" দেখে, শ্রীকান্ত একসময় ফিরতি পথে রওনা হল। পথে দুজন ছাতা মাথায় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল, যাঁরা সতীশ সম্পর্কে জানালেন, "মাতাল, বদমাইস, জোচ্চোর।" পরে এও বললেন, "দোষ নেই মশায় ... কোম্পানি বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সে-ই চোর না হয়ে পারবে না। এমনি এদের ছোঁয়াচের গুণ!" পরে হাঁটতে হাঁটতে কথা প্রসঙ্গে আরও অনেক কিছু জানালেন এই রেল কোম্পানির ব্রিটিশ ব্যবসা সম্পর্কে।

> কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শষ্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে। ... সমস্ত অনিষ্টের গোড়া হচ্ছে এই রেলগাড়ি। শিরার মত দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলের রাস্তা যদি না ঢুকতে পেত, খাবার জিনিস চালান দিয়ে পয়সা রোজগারের এত সুযোগ না থাকত, আর সেই মানুষ যদি এমন পাগল হয়ে না উঠত, এত দুর্দশা দেশের হোতো না। ... মশাই, এই রেল, এই কল, এই লোহা-বাঁধানো রাস্তা–এই তো হল পবিত্র vested interest–এই গুরুভারেই তো সংসারে কোথাও গরীবের নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই।

এই গোটা আলোচনাটা আমাদের একটুও অপরিচিত নয়। আমি শুধু একটু মনে করিয়ে দিলাম। এই বেদনার জায়গাটা এবং এর বিপরীতে ক্রমপ্রসারমান যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের ছটা ওই আলোচনার পরিসরেও এসেছে, এবং ব্যাপক ভাবে এটা এসেছে মার্ক্সের প্রচুর লেখায়। যেমন, দি ফিউচার রেজাল্টস অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া, প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে, ১৮৫৩-য় (http://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/07/22.htm)। এরকম আরও অনেক আছে। মার্ক্স খুব ভাল ভাবে ব্রিটিশ ভারতে শিরা-উপশিরার মত বিস্তৃত রেলপথজালের অভ্যন্তরীন গতিবিজ্ঞানটাকে চিহ্নিত করেছেন। তার সার্বিক ঘাতটাকে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্তরেও, অনেক দূর অব্দি লক্ষ্য করেছেন। কী ভাবে ভারতীয় সমাজকে সেটা ভিতর থেকে বদলে দিচ্ছে, সেটাকে মার্ক্স লক্ষ্য করেছিলেন। ভারত রাষ্ট্র বলে আজ যাকে আমরা চিনি, তা অনেকটাই সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটিশের এই রেলের হাতে। বাজারের নিরিখে, আদানপ্রদানের নিরিখে, ভূমি ও ভূগোলের বোধের নিরিখে। বিভূতির অজস্র গল্পে এটা এসেছে। খুব প্রতিনিধিস্থানীয় এরকম একটা চিহ্ন রয়েছে 'ক্ষণভঙ্গুর' সঙ্কলনের 'সিঁদুরচরণ' গল্পে। "এই পিথিমির কি কোনও সিমেমুড়ো নেই" জাতীয় বিস্ময়কে তার আঞ্চলিকতার ধারণায় আচ্ছন্ন বলে আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি, যখন দেখি তার বিস্ময় তৈরি হওয়ার রসদ রেলপথের মাপে দাঁড়ায়, চব্বিশ পরগনা থেকে নদীয়া, বনগাঁ থেকে কৃষ্ণনগর। "আপনি কেষ্টলগর চেন? ... বাহাদুরপুর কেষ্টলগরের দু'ইস্টিশনের পরে" – আমাদের পরিচিত ভূগোলে সিঁদুরচরণের বিস্ময়ের পৃথিবীকে অনুবাদ করে দিচ্ছেন লেখক। আর সেই ভূগোলটা নিতান্তই রেলপথ-নির্ভর, দূরত্বের একক 'ইস্টিশন'। আবার 'ইছামতী' উপন্যাসের শেষে এসে আমরা দেখি, সমাজজীবনে নতুন ধরনের সব গতিময়তার সূচনা হচ্ছে। তিলু বিলু নীলুদের স্থানান্তর এবং যানের ধারণাটাই বদলে যাচ্ছে, রেলপথের অভিঘাতে তৈরি হচ্ছে একটা উল্লসিত বিস্ময়।

> আর ছোট মা তো কিছু জানেই না। কলের গাড়ীতে উঠে সেদিন দেখলে না? পান সাজতে বসলো। রানাঘাট থেকে কলের গাড়ী ছাড়লো তো টুক করে এলো আড়ংঘাটা। আর ছোট মার কি কষ্ট! বললে, দুটো পান সাজতি সাজতি গাড়ী এসে গেল তিনকোশ রাস্তা! হি হি–।

শরৎচন্দ্র অসুখ ও বেদনাটাকে ধরেছিলেন, কিন্তু এই সৃষ্টিশীল গতিমুখটাকে ধরতে পারেননি, বা চাননি

ধরতে। শরৎচন্দ্রের মধ্যে ওই বিষয়ী-অবস্থানটা (যাকে বাংলায় বলে সাবজেক্ট পোজিশন) থাকতই। বাস্তবতাকে তার নিজের মতামত ও মূল্যায়ন দিয়ে সাজিয়ে নেওয়া তো বটেই, এমনকি তার বিপরীত-যাত্রাতেও পাঠিয়ে দেওয়া। যেমন, কলকাতার ও জেলার আদালতগুলিতে যখন পরের পর একান্নবর্তী পরিবার ও সম্পত্তিভাগের মামলা বেড়ে উঠছে, ব্রিটিশ আমলের শেষ ভাগে নতুন ধরনের পুঁজি ও বাজার সৃষ্টির গতিতে, ঠিক সেই সময়ই শরৎচন্দ্র লিখে যাচ্ছেন 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' জাতীয় আখ্যান, যাতে পরিবার ও সম্পত্তি ফের জোড়া লেগে যাচ্ছে। এটার মধ্যে ব্যক্তি লেখকের নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগা ঔচিত্য অনৌচিত্য বোধের ছাপ থাকছে। হয়ত ব্যক্তি লেখকের নিজের স্বপ্নপূরণ থাকছে, যা ঘটুক বলে তিনি চাইতেন। আমি জানিনা, বাস্তবতার চিত্রণ থেকে এই বিচ্যুতি কোনও সমস্যা বলে ডাকা যায় কিনা। আমার এক নাট্য-পরিচালক বন্ধু যেমন বলে, অভিনয়ের কথা যদি বলো, তাহলে এই গ্রহের সবচেয়ে বাস্তবসম্মত অভিনয় করেছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' সিনেমায়, না সরি, উত্তমকুমার নয়, ওই গরুটা যেটা ঘাস খাচ্ছিল বাড়ির বাইরে। তাই বাস্তবতার চিত্রণটা গুরুত্বপূর্ণ, নাকি তার ভিতর অনুপ্রবেশটা, তা বলতে পারি না। এবং যা দেখছি ক্রমে, যত দিন যাচ্ছে, যা যা জানতাম বা বুঝতাম বলে ভাবতাম, তা সবই ক্রমে আরও ঘেঁটে যাচ্ছে। আমার যুবক বয়সে, মার্ক্সবাদী রাজনীতির সক্রিয়তার বয়সে যেমন মনে হত, এ তো এক রকমের ইচ্ছাপূরণ, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটবে, আরও কিছু পরে, হাফপ্যান্ট পরা নাতি-হয়ে-যাওয়া ধর্মেন্দ্র আর ফ্রক-পরা অন্যূন-বয়স্কা যোগিতা বালির ইস্কুলের সিলিপ ঘিরে নাচ-গানে। আমার তখনকার এক বামপন্থী বন্ধু লিখেছিল রাজ কাপুরের একটা মতামতের কথা, পরে আমি বহু খুঁজেও আর সেটা কখনও পাইনি, তাই জানিনা সেটা খুব সঠিক কিনা, আর সেই বন্ধুও মারা গেছে। তার লেখায় ছিল, রাজ কাপুর বলেছেন, আমি চাইলেই একজন বেশ্যাকে ফোনে ডাকতে পারি, ভারতের খুব কম মানুষেরই সেটা সামর্থের মধ্যে পড়ে, তাই তাদের এই যৌন আনন্দ দেওয়ার জন্যেই আমি ফিল্ম বানাই। আজ মনে হয়, রাজ কাপুর তো ভুল কিছু বলেন নি, ক্ষতি কী এমনধারা ফিল্মে? বাংলা 'শিল্প' শব্দটার ইংরিজি তো 'আর্ট' আর 'ইন্ডাস্ট্রি' দুইই। তাহলে অসুবিধা কোথায়? ইচ্ছাপূরণের ইন্ডাস্ট্রিতে? সেটা গ্রেট আর্ট হয়ত হবে না, কিন্তু তাতে তো ইতিহাস এক ভাবে বিধৃত থাকবেই। আর্ট আর ইন্ডাস্ট্রি দুই-ই তো শেষ অব্দি যায় একই ইতিহাসের চাঁড়িতে।

কিন্তু এটুকু বলাই যায়, শরৎচন্দ্রের অনেক অবেক্ষণই প্রবলভাবে তার মনোভঙ্গী দ্বারা আক্রান্ত থাকত। যেমন ওই শ্রীকান্ততেই, ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ আছে তাঁর যার তীক্ষ্ণতাটা অনস্বীকার্য, কিন্তু তার ইতিহাস-সম্মতিটা বিচারের অপেক্ষায় থাকে। রেল সম্পর্কে তার মতামতটা একটু একপেশে লাগে। আরও সেই 'শ্রীকান্ত' লেখকের যার চতুর্থ পর্ব তথা গোটা উপন্যাসটাই শেষ হবে বিষন্নতার ওই অলৌকিক চিত্রণে, কমললতা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল, ট্রেনটা চলতে শুরু করল, একের পর এক কামরার আলো তার মুখে পড়ছে, আলোকিত হচ্ছে, আবার অন্ধকারে চলে যাচ্ছে – এবং অস্পষ্ট হতে হতে ক্রমে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই রূপকল্পটা যাঁর হাতে তৈরিই হতে পারত না, যদি রেল না থাকত। কিন্তু 'কবি' ফিল্মে আমরা দেখব, রেলপথ আসছে পুরো একটা নতুন ধাঁচের গতিময় উন্মুক্ততার প্রতীক হয়ে। এবং 'কবি' উপন্যাসে যতটা এসেছে তার চেয়েও বেশি করে এসেছে 'কবি' ফিল্মে। রেল/রেলপথ/রেল-ইস্টিশন/রেলযাত্রার প্রসঙ্গ বা উল্লেখ বা ছবি বা শব্দ ফিল্মটায় এসেছে কয়েকশো বার। শুরুও হচ্ছে রেলগাড়ির ভোঁ দিয়ে, আবার শেষও হচ্ছে রেল লাইনের ছবি দিয়ে, দুই সমান্তরাল রেখা চলে গেছে সোজা অনন্তের দিকে ... ক্রমে কাছে আসছে, কিন্তু মিলছে না কখনওই। এমনকি প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটমানতাতেই বদলের সচেতনতা এনে দিচ্ছে ট্রেনের আওয়াজ বা উল্লেখ। এটা এত বেশি সংখ্যায় যে প্রতিবার খেয়াল করানো সম্ভবও নয়, কোনও মানেও হয় না। তাই, একদম প্রথমেই এটা উল্লেখ করে দেওয়া। রেলের এই উপস্থিতি সেই সময়ের ঘটমান ভারতীয় সমাজ জীবনের একটা নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নের মত রয়েছে গোটা 'কবি' ফিল্ম জুড়ে, উপন্যাসে যতটা আছে ফিল্মে তার চেয়ে অনেক বেশি করে।

বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' উপন্যাসে, ঐতিহাসিক ভাবেই, আমরা কেবল রেল-উপস্থিতির শুরুটা দেখছি।

তাও বেশ কয়েকটি মন্তব্যে সেটা ধরা আছে উপন্যাসের শেষের দিকটায়। আর অপ্রতিরোধ্য ভাবে সেটা এসেছে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে। 'পথের পাঁচালী' ফিল্মটির নাম 'পথের পাঁচালী' হলেও, তার গোটা 'বল্লালী বালাই' অংশটি বাদ দিয়ে ফিল্মের শুরু 'আম আঁটির ভেঁপু' থেকে। তাতেও, 'পথের পাঁচালী' ফিল্মে রেলের সেই জীবন্ত দৃশ্যটা আমরা সকলেই জানি, কাশফুলের বন পেরিয়ে অপুর রেল দেখা। তাও, আমার বারবারই মনে হয়, ঠিক 'বল্লালী বালাই'-এর মত, সমাজ ইতিহাসের জ্যান্ত বাস্তবতাটা বেশ বড় রকমেই বাদ পড়ে গেছে 'পথের পাঁচালী' ফিল্মে। সত্যজিত রায় বোধহয় সমাজ বাস্তবতার চেয়ে ব্যক্তি আবেগ-অনুভূতির টানাপোড়েনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই রেল নিয়েই যে তীব্রতা 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে এসেছিল, তার খুব কাছাকাছি ছিল বরং 'অপরাজিত' ফিল্মের একটি দৃশ্য। দৃশ্যটার শুরু 'অপরাজিত' ফিল্মের ৩৯ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সর্বজয়া দেখলেন, মনিব-বাড়ির কাজেরই অংশ হিসাবে তামাকের টিকায় ফুঁ দিচ্ছে অপু। ৩৯ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড থেকে এই গোটাটা নিয়ে ত্রস্ত দুশ্চিন্তিত সর্বজয়া নিজের ভিতরে ডুবে গেলেন, ৪০ মিনিট ১৬ সেকেন্ডে গিয়ে রেলের ভোঁ শুরু হল, সর্বজয়া বাইরের দিকে তাকালেন, ৪০ মিনিট ২২ সেকেন্ডে পর্দায় চলে এল ট্রেন, ৪০ মিনিট ২৭ সেকেন্ডে এসে দেখা গেল ট্রেনে আসীন সর্বজয়া অপুদের। পুরো বাহান্ন সেকেন্ড জুড়ে তৈরি এই বিপন্নতাটা, সর্বজয়ার আঁকড়ে থাকার একমাত্র আশ্রয় অপু ঠিক মানুষ হবে তো, তার চাপ, তার নাটক, তার থেকে তৈরি কাশী থেকে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত – এই গোটা মোচড়টা হাজির হয়ে গেল এই ট্রেন দৃশ্যে। যে গতিশীলতার অভাব আমি অনুভব করি 'পথের পাঁচালী' ফিল্মে। শুধু ট্রেন না, পরিবারকে অসম্ভব বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে পরিবারের বাইরের বাস্তবতাটাকে খুব লঘু করে দেওয়া হয়েছে, 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের তুলনায় ফিল্মে, এরকমই লাগে। বরং 'কবি' ফিল্মে ঠিক তার উল্টোটা মাথায় আসে। এই ফিল্মের চিত্রনাট্য এবং সংলাপ তারাশঙ্করেরই করা। ধরে নিচ্ছি ১৯৪৯-এর ফিল্মের চিত্রনাট্য তিনি ১৯৪৮-এ লিখেছিলেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮ এই দশ বছর সময় পেয়েছিলেন তারাশঙ্কর আরও পরিণত হয়ে ওঠার। চিত্রনাট্য করার সময়ে যে বেমক্কা রকমের ভাল করে খুঁটিয়ে পড়তে হয়েছিল তাঁর নিজেরই উপন্যাসটা, তার ছাপ ছড়িয়ে আছে গোটা ফিল্মে। যে গানগুলো মূল উপন্যাসে আছে, তার অনেকগুলোই বদলেছেন, ঘটনার সংস্থানকে বদলেছেন, নতুন অনেক উপাদান এনেছেন। যার অনেকগুলোই আমার অত্যন্ত লাগসই লেগেছে। কয়েক জায়গায় আমি চিহ্নিতও করব কোনও কোনও বিশেষ বিষয় উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্যে প্রকটতর হওয়ার বিষয়টি। বিশেষ করে রেলকেন্দ্রিক গতি ও ঘাতটার বেলায় যা খুব বেশি করে সত্যি। তাই আমার যে বন্ধু আমায় গর্দভ বলেছিল ওই রেলের ভোঁ-টা আলাদা করে খেয়াল করানোয়, সে এটা বোঝেনি গর্দভের মত ডাকছিলাম হয়ত, কিন্তু প্রয়োজনীয় জায়গাতেই ডাকছিলাম।

11
00:03:00,030 --> 00:03:02,789
Beware, folks.
Train is coming.

"ধরমপায়ে যাও ভাই, গাড়ি আওত হ্যায়।" আমি খুব নিশ্চিত নই, সাউন্ডট্র্যাকের সমস্যার কথা তো আগেই বলেছি, বাংলায় যে আন্দাজটা আমি অনেকটা করতে পারছি, অন্য ভাষায় সেটা হচ্ছে না। তবে আমি আমার হিন্দিভাষী সহকর্মীদেরও শুনিয়ে দেখেছি। তাদেরও বাক্যটা ওরকমই লাগছে। তবে বাক্যটা এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়ও। কী বলতে চাইছে সেটা বোঝা যাচ্ছে খুব সহজেই। গুরুত্বপূর্ণ এখানে গোড়া থেকেই এই অবাংলাভাষী রেলকর্মীর অস্তিত্বটা উচ্চারিত হয়ে যাওয়া। উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্যে খুব সচেতন বদলগুলোর এটা একটা। উপন্যাসে এই চরিত্রটাই নেই। এমনকি উপন্যাসের শেষে নিতাই যখন ফের ফিরে এল চণ্ডীতলা ইস্টিশনে, সেখানের লোকজন তাকে ঘিরে এল। এক সময় মিছে শিরোপার গল্পে যে সম্মান নিজেই নিজেকে দিতে চেয়েছিল, সেই সম্মান এল আপনা থেকেই। উপন্যাসে এটা উল্লেখিত আছে নিতাইয়ের নিজের কেনা মিছে শিরোপা, ফিল্মে সেটা আর বলা হয়নি, শুধু শিরোপাটাই দেখানো

হয়েছে। এটাও একটা বদল, কিন্তু তেমন জরুরি কিছু নয়।

> নিতাই দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চারদিকে বিস্মিত একটি জনতা। নিতাই এমনটি প্রত্যাশা করে নাই। এত স্নেহ, এত সমাদর তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে এখানে? রাজার মুখে পর্যন্ত কথা নাই। বেনে মামা, দেবেন, কেষ্ট দাস, রামলাল, কয়েকজন ভদ্রলোক পর্যন্ত তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটি।

এখানে 'কয়েকজন ভদ্রলোক পর্যন্ত' শব্দবন্ধটা খেয়াল রাখুন। পরে আমরা এই প্রসঙ্গে ফিরে আসব। এবার খেয়াল করুন ইস্টিশনে সমাগত লোকের নামের তালিকাটা। সেখানে 'বালিয়া' নামটা তো নেইই, এমনকি খুব উচ্চারিত ভাবে অবাংলাভাষী কোনও নামই নেই। এর মধ্যে বেনেমামা চরিত্রটি ফিল্মে বেশ কয়েক বার এসেছে। কিন্তু ফিল্মে খুব উচ্চারিত যে বালিয়া, যার বাক্য আমরা উদ্ধৃত করলাম এই প্রসঙ্গটার শুরুতে, তার নাম না থাকার অর্থ এটাই। এই বালিয়া চরিত্রটি ফিল্মে একটি সচেতন সংযোজন। এবং বালিয়া চরিত্রটির গুরুত্ব ফিল্মে কতটা সে তো আমরা দেখতেই পাই। ঝুমুর দলের সঙ্গে বাইরে জেলায় জেলায় ঘুরতে যাওয়ার বাইরে চণ্ডীতলার জীবনের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাতেই আমরা বালিয়াকে পাই ফিল্মে। বালিয়া 'কবি' ফিল্মে একটি ভোজপুরি লোকগীতিও গায়। অবাংলাভাষী শ্রমিকদের উপস্থিতি, যা খুব প্রবল ভাবে ঘটতে শুরু করে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে, তারই একটা প্রতীক বালিয়া। শুধু বালিয়াই নয়, বালিয়ার সংলাপে আমরা আরও অবাংলাভাষী চরিত্রের উল্লেখও পাই। এই জায়গাটাকে নিয়ে আমরা ফের কথা বলব, যখন রাজন, উপন্যাসে যার নাম রাজালাল বায়েন, ফিল্মে যাকে স্টেশনমাস্টার ছাড়া আর সবাই, নিতাইয়ের দেখাদেখি 'রাজন' বলে ডাকে, তার সূত্রে আমরা সঙ্কর পরিচিতি, হাইব্রিড আইডেন্টিটির আলোচনায় আসব।

21
00:03:48,790 --> 00:03:53,790
Son of a Bengali cobbler,
Went to war that long ago -
22

00:03:53,790 --> 00:03:58,990
- Still speaking millitary Hindi?
That too 90% mistakes![04]

> ব্যাটা বাঙালি মুচির সন্তান – কবে গিয়েছিল লড়াইয়ে, এখনও মুখে মিলিটারি হিন্দি, তাও পনেরো আনা ভুল।

এটি বলেন স্টেশনমাস্টার, যাকে কোট ছেড়ে পিরান পরে আমরা কবিগানের আসরেও একটা কর্তৃত্বের ভূমিকা নিতে দেখব। হিন্দি এবং বাংলার প্রসঙ্গে 'মুচি' শব্দটাকে খেয়াল করতে ভুলবেন না। নিতাই এবং রাজা, সংস্কৃত সম্বোধনের নিয়মে যাকে 'রাজন' বলে ডাকে নিতাই, অত্যন্ত ভাল বন্ধু, এবং দুজনেই নিচু জাতের। নিতাই ডোম, এবং রাজন মুচি। সেই নিতাই কবিয়াল হয়ে উঠছে, যা গোটাটাই উঁচু জাতের এক্তিয়ারে, এই নাটকটাই হল 'কবি' ফিল্ম এবং উপন্যাসের একটা মূল চালিকাশক্তি। 'কবি' উপন্যাসের শুরুর প্যারাটাই হল:

> শুধু দস্তুরমত একটা বিস্ময়কর ঘটনাই নয়, রীতিমত এক সংঘটন। চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল।

এবং 'কবি' ফিল্মও তার দ্বিতীয় সংলাপেই, রাজন যেখানে ড্রাইভারকে তাড়া দিচ্ছে কবিগানের আসরের কথা তুলে, উল্লেখ করে নেয় এই কবিগানের কথা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। তার আগে রাজনের প্রসঙ্গে কিছু বলে নিই। 'আমার সাহিত্য-জীবন' দ্বিতীয় খণ্ডে তারাশঙ্করের একটা ভাষ্য আছে এই

রাজা চরিত্রটির মূল বাস্তব ঠিকানা নিয়ে। সেটা আগে একটু পড়ে নেওয়া যাক।

> রাজার নাম রাজা মিয়া, সে জাতিতে মুসলমান এবং হিন্দীও সে বলেও না, যুদ্ধেও যায় নি, মেজাজেও মিলিটারি নয়–ওটুকু আমার চড়ানো পোষাক বা রঙ যাই হোক না কেন।

মুসলমান মূল চরিত্রের সঙ্গে হিন্দি এসে যাওয়াটা খুব একটা বিস্ময়কর লাগে না। এই গত মাসেও, পুজোর ঠিক আগে আগে, একদিন শেয়ারের ট্যাক্সিতে ফিরছিলাম। কী একটা কথায় বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের কথা ওঠে। এবং আমি তাদের বাঙালি বলে উল্লেখ করায় ড্রাইভারটি ভারি অবাক হয়ে আমায় জিগেশ করলেন, "বাঙালি কোথায়, ওরা তো মুসলমান।" এবং এ ভারী দীর্ঘস্থায়ী একটি পশ্চিম-বাঙালি ভুল। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারিতে, মানে যে সব বইটই পড়তে পড়তে তারাশঙ্করের লেখকজীবন শুরু হচ্ছে। তার প্রথম পাতায়, পঞ্চম প্যারাগ্রাফেই ছিল:

> ইস্কুলের মাঠে বাঙালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ'। সন্ধ্যা হয়-হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই।

Roll-call before the advance: Inspection of Indian warriors in Mesopotamia.

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট জিনিস লক্ষ্য করিয়ে রাখা যাক। ওই 'ফুটবল ম্যাচ' শব্দবন্ধটা, শরৎচন্দ্র একক উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে দিয়েছেন। আজকের কোনও বাংলা লেখায় প্রবন্ধে পত্রিকায় উপন্যাসে যা আর হয় না, কারণ তখন ওই শব্দবন্ধ বাংলা বাচনে কেবল আসতে শুরু করেছিল। ঠিক অমনই একটা জিনিস একটু বাদে আমরা ঘটতে দেখব 'মেডেল' শব্দটাকে নিয়ে। যাই হোক, মূল জায়গা রাজা-য় ফেরা যাক। রাজা মিয়া মুসলমান, মুসলমান মানে না-বাঙালি, সেখান থেকে এক লপ্তে হিন্দিটা এসেই যেতে পারে, শিল্পী মনের একটা খেয়ালে। যদি সেটা এসেও থাকে, যুদ্ধটা এল কেন? এবং খেয়াল রাখুন যুদ্ধটা মেসোপটেমিয়া যুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশের মূল ফ্রন্ট। এবং যে যুদ্ধটায় কিছু অফিসার ছিল ব্রিটিশ, কিন্ত সেক্সপিয়ারের হেনরি ফোর নাটকের ফলস্টাফ কথিত সেই 'কামানের খাদ্য', ক্যানন ফডার, সরবরাহ করেছিল ভারতীয়রাই। ছবিটায় দেখুন, মূল অফিসারটি সাহেব, সামনে সারি সারি নেটিভ সৈন্য, পাশের মধ্যপদস্থ কটিও কালা-চামড়া। ছবিটা পাওয়া মেসোপটেমিয়া যুদ্ধ (১৯১৪-১৮) নিয়ে একটি লেখায় (http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Mesopotamia/Fall_of_Kut_01.htm)। ছবিটা দেখতে দেখতে আমার একটু রাগও হচ্ছিল। এর আগে ব্রিটেনের দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে (১৮৭৮-৮০) প্রাপ্ত একটি যেজাইল বুলেটক্ষত কত বিরাট একটা জায়গা করে নিল ইংরিজি সাহিত্যে,

যদিও গোটা শার্লক হোমসের কাহিনীমালা জুড়ে ওয়াটসনের ওই বুলেটক্ষত বারবার জায়গা বদল করেছে, কখনও হাতে কখনও পায়ে। ইংরেজরা বোধহয় নিশ্চিত ছিল না ক্ষতটা তাদের ঠিক কোথায়। ভারতীয়দের জিগেশ করলেই জানতে পারত, কত নিশ্চিত মৃত্যু তারা সমর্পণ করে এসেছে মধ্যপ্রাচ্যে, ভারতীয়রা সেটা নিশ্চিত ভাবে জানত।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি যুদ্ধের মত এই মেসোপটেমিয়া যুদ্ধেও একটা বিরাট সংখ্যক যুদ্ধশ্রমিকই, কুলি থেকে সৈনিক, ছিল মূলত ভারতীয়। রাজনকে তারই একজন কুলি বানালেন তারাশঙ্কর। কেন? মেসোপটেমিয়া যুদ্ধের, সামগ্রীক ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরই, একটা বিরাট প্রভাব পড়েছিল ভারতীয় অর্থনীতিতে সমাজে সংস্কৃতিতে। তার একটা ছায়া আছেই। আর সবচেয়ে বড় কথা সমাজবদলের একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছিল। হোমি ভাভা উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক সংস্কৃতিবিদ্যায় একটা কোমের বা কমিউনিটির নিজের পরিচিতিবোধ বা আইডেন্টিটি নিয়ে খুব মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। আমাদের মার্জিন অফ মার্জিন বইয়ে (http://ddts.randomink.org/english/mom-book/index.html) তার অনেক আলোচনা করেছি আমরা, তার সূত্রে রাজনৈতিক অর্থনীতির নানা জায়গাকে ধরার চেষ্টাও করেছি। এই লেখাটা কোনও মতেই তার সঠিক ক্ষেত্র নয়। কিন্তু মোদ্দা বিষয়টা এই যে, বাঙালি আপনা থেকে বাঙালি হয়ে ওঠে না, নিজেকে বাঙালি বলে চেনে না। লাজবাব ওটা লিখেছিলেন বিবেকানন্দ, গোরার বুটের লাথিতে আমরা সব এক আনা দুই আনা তিন পাইয়ের বিভিন্ন আর্যমাত্রার ভিন্নতা ছেড়ে এক লাথিভিত্তিক মহান ঐক্যে প্রোথিত হলাম – একই পরিচিতি – কালা চামড়া। মানে, তৈরি হল ভারত ও ভারতীয় এই পরিচিতি। ওই যুদ্ধগুলো যেমন, যুদ্ধেই তো লাথিগুলো সবচেয়ে উচ্চারিত হয়ে ওঠে, অ্যাকাডেমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনাসভায় যে লাথিগুলো গোপন থাকে। ব্রিটিশ বুটের চামড়াও কালো হত, তখনও বিচিত্রবর্ণ মার্কিন স্নিকার চালু হয়নি। সেই কালো চামড়া ভারতরাষ্ট্রের সূচনা হওয়া মাত্রই তা খুলে দিল আরও নানা পরিচিতির দিকনির্দেশ, ভারতীয় বলেই তো সব এক নয়, সেখানে বিহারী আছে পাঞ্জাবি আছে গুজরাতি আছে। বিহারী পাঞ্জাবি গুজরাতিদের সম্মুখীনতায় এসে বাঙালি নিজেকে বাঙালি বলে চিনল জানল। মনে পড়ছে, 'আরণ্যক'-এ, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে, সত্যচরণকে দেখে, বাঙালি বলে চিনতে না পেরে, অন্য বাঙালিরা তাকে 'আমব্রেলু' মানে 'ছাতু' বলে ডেকেছিল? নিজের পরিচিতিকে নিজের বাইরে গিয়ে দেখতে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল সত্যচরণ, লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলকে ন্যাড়া করে দিতে দিতে। এইখানটায় একটা ব্যাপক ভাঙচুর আছে বিভূতিতে। লবজাগরলের বাঙালি যেমন, 'নৌকাডুবি'-র রমেশকে ধরুন, বা 'চরিত্রহীন'-এর সতীশ, যতবার পশ্চিমে যায়, শুধু বাঙলাভাষীদের সঙ্গে, বাঙলা ভাষাতেই কথা বলে। 'শেষ প্রশ্ন' ভাবুন, গোটাটা ঘটতে শুরু করছে আগ্রায়, কিন্তু আগ্রার জীবন ভাষা সমাজ কিছুই নেই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পর উপন্যাসে এরকমই চলে। পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন 'পথের দাবী' উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে। সেখানে রেঙ্গুন বার্মা দক্ষিন এশিয়া অনেকটাই এসেছে, এসেছে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও। অথচ বাঙালি ব্যতিরেকে অবশিষ্ট ভারত আসেনি কোথাও। আজকের মার্কিনকে যেমন রসিকতায় বলা হয়, তার কাছে রেস্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড, অবশিষ্ট ভুবন, পৌঁছয়ই না মোটে তার কাছে, সে জানেই না ওরকম কিছু যে আছে কোথাও, বাঙালির কাছেও বোধহয় পৌঁছত না অবশিষ্ট ভারত।

এবার এর নিরিখে 'কবি' ভাবুন। প্রথমেই তো একটা কেলেঙ্কারি দিয়ে শুরু হচ্ছে। এক ব্যাটা ডোম, সে হল নায়ক, আর তার নিকটতম বন্ধু তথা মূল চরিত্র একটা মুচি। সেটা আবার যুদ্ধের কুলি ছিল। একই বাঙলার মধ্যে অন্য অন্য নানা বাঙলা জেগে উঠছে। শুধু বাঙলাই না, জেগে উঠছে ভারতও। একটা কোমের পরিচিতিবোধ বা আইডেন্টিটি তৈরি একটা মিশ্র সঙ্কর হাইব্রিড সাংস্কৃতিক ভূমিতে। ওই বোধটা তৈরি হয় দুটো পরিচিতি বা আইডেন্টিটির সংলাপে পারস্পরিকতায়, দুটো বর্গের মাধ্যমিক ভূমিতে, ইন্টারস্টিসে। দুটো মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের জ্যান্ত ইতিহাসে এই ভূমিটা তৈরি হচ্ছিল, এবার তাকে ফিল্মে জায়গা করে দিল 'কবি'। এবং দেখুন, উপন্যাস ও ফিল্মের মধ্যবর্তী দশকটায় এই পরিবর্তমান অর্থনীতির চাপটা আরও ঘনীভূত হচ্ছিল, তার প্রতিনিধি হয়ে যোগ হল সম্পূর্ণ নতুন একটি চরিত্র, বালিয়া। যে শুধু এলই না,

একটা ভোজপুরী গানও গাইল, ফিল্মের প্রথম সংলাপটিও বলল। রাজন বালিয়া ইত্যাদিরা মিলে রেলপথ ও রেল ইস্টিশনকে কেন্দ্র করে রচনা করল বিভিন্ন পরিচিতিগুলির একটি সঙ্কর ভূমি। যে সঙ্কর ভূমিতে এবার রচিত হল 'কবি' ফিল্মের প্রেক্ষাপট। রেল এই গোটাটার আধারভূমি হয়ে ওঠাটা সেই দিক দিয়ে ভারি সঙ্গত। রেল অবশ্যই একটি প্রথমতম মাতৃক্রোড় এই সঙ্কর পরিচিতির ভূমিতে ভারতের রাষ্ট্রীয় সত্তার জন্মে ওঠার। বাঙালি বিহারী গুজরাতি সবাই যেখানে এক, রেল কর্মচারী। শুধু এই নয়, আরও নানা ভিন্ন ধরনের সঙ্কর ভূমিকে চিহ্নিত করে দেয় 'কবি' ফিল্ম, শিল্পের অর্থ নির্মাণের আরও কিছু বৈশিষ্টকেও নির্দিষ্ট করে দেয়, আমরা দেখতে পাব একটু পরেই। এবং রাজা সেই অর্থে একাধিক ধরনের বর্গ-সঙ্করতার আকর, যেগুলি গজিয়ে উঠছে তার 'মুচি' নামক প্রদত্ত আবহমান কৌম পরিচয়ের চারপাশে – সে হিন্দি বলে, সে যুদ্ধফেরত কুলি, এবং সে রেলের পয়েন্টসম্যান। এবং এই নানা ধরনের বর্গ-সঙ্করতা তাকে সামাজিক ক্রিয়ার চিরাচরিত অর্থগুলির বাইরে এসে তাকানোর সামর্থও দিয়েছিল, যা শুদ্ধ বর্গীয় অবস্থান থেকে সম্ভব ছিল না। ঠাকুরঝি ও নিতাইয়ের সম্পর্ক নয় শুধু, আরও বহু জায়গাতেই সে প্রদত্ত ছক থেকে বাইরে এসে তাকাতে পারত, আমরা ক্রমে দেখতে পাব। যে প্রশ্নটা সে পরে করবে নিতাইকে, "পেয়ারমে জাত কেয়া হ্যায়", সেটা শুধু যে সেই নতুন অর্থকেই দেখাচ্ছে তাই নয়, প্রশ্নের গঠনটাকে ভাবুন, 'জাত' নামক শব্দের শব্দার্থগত অস্তিত্বের জায়গা থেকে সে প্রশ্ন করছে। শুধু বর্গটাকে অস্বীকার করা বা না মানার প্রশ্ন নয়, বর্গটাকেই সে আর খুঁজে পাচ্ছে না, সেটা তার কাছে ইতিমধ্যেই 'কেয়া হ্যায়' হয়ে গেছে।

42
00:05:39,190 --> 00:05:49,590
Let me be an ape, and write
Rama in gold on my ribs. [12]

> আহা, কপি যেন হতে পারি।/ যেন এ বুকের পাঁজরে,/ রামনামটি লেখা থাকে সোনার আখরে।

ব্রাহ্মণ বিপ্রপদ ঠাকুরের আক্রমণের বিপরীতে নিতাইয়ের এই উত্তরটির মধ্যে সেই টানাপোড়েন এবং স্ববিরোধটা নিহিত রয়েছে, এবং সেটা আগাগোড়াই থাকবে গোটা 'কবি' ফিল্মে, সব সময়ই খুঁজে বেড়ানো এবং কখনওই খুব স্পষ্ট করে নিজের জায়গাটা খুঁজে না পাওয়া। সে নিচু জাত, ডোম বলে নিগৃহীত যে জাতিব্যবস্থার হাতে, সেই তার কাছেই তাকে স্বীকৃতি নিতে হবে কবিয়াল হয়ে ওঠার। নিজের সামাজিক অর্থনৈতিক পেশাগত জায়গা থেকে যে বর্গ-সঙ্করতাটা অর্জন করে রাজা, কবিকে সেটা পেতে হয় নিজের শিল্পীসত্তার নির্ণয়ের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। যে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা তাকে নিচু জাত ডোম করে, সেই রামায়ণের আলোচনা বা ডিসকোর্সকে নির্ভর করেই তাকে কবিয়াল হয়ে উঠতে হয়। এই স্ববিরোধ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে একটু বাদে, যখন কবিগানের আসরে তার ডোম জাতি তুলে নানা গালিগালাজের পর, নিতাইয়ের কাকা-মামা জাতভাইরা তাকে উঠে আসতে বলবে। নিতাই জানাবে যে তা সে পারে না, তাতে দেবী চণ্ডীর অপমান হবে। তখন জাতের অপমানের নিতাই তোয়াক্কা করছে না বলে তার জাতভাইরা তাকে পরিত্যাগ করবে। নিতাইয়ের ঘরের লোকেরা তাকে তখন এনে ছুঁড়ে দেবে তার বইগুলো। সেই বইয়ের সংগ্রহের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে ওই স্ববিরোধ। আমরা সেই কথায় আসছি। এখানে ব্রাহ্মণ বিপ্রপদ ঠাকুরকে যে ছড়াটা বানিয়ে শোনায় নিতাই তাও রামায়ণ-নির্ভর, যে রামায়ণ ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার একটা স্তম্ভ। নিতাইকে জাতিব্যবস্থার নিগ্রহের নিরাকরণ করতে হবে জাতিব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই, তাকে মেনেই, তাকে অস্বীকার করে নয়। ঠাকুরঝি আর বসন, শুধু এই দুই মেরুই নয়, নিতাই আসলে নড়ে বেড়িয়েছে তার জাতিব্যবস্থার প্রত্যয়ীকৃত কবিয়াল পরিচিতি আর তার ডোম এই পরিচিতি এই দুইয়েরই ভিতর। তারাশঙ্কর তার উপন্যাসে নিতাইয়ের বিদ্যাসন্ধানের নিজস্ব রকমকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। সেই বিবরণটার মধ্যে কলকাতা থেকে দূরে তখনকার বাংলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা-সংস্কৃতির একটা আলগা ছবিও পাওয়া যায়, যা বোধহয় এখনও তেমন বদলায়নি।

> এই দুই বৎসরে পুরস্কার হিসাবে কাপড়, জামা, গামছা, লণ্ঠন, ছাড়াও নিতাই পাইয়াছিল খানকয়েক বই–শিশুবোধ রামায়ণ, মহাভারতের কথা, জানোয়ারের গল্প। সেগুলি নিতাইয়ের কণ্ঠস্থ। নিতাই সুযোগ পাইলে আরও পড়িত, কিন্তু একমাত্র নিতাই ছাড়া পাঠশালায় আর দ্বিতীয় ছাত্র না থাকায় পাঠশালাটিই উঠিয়া গেল। অগত্যা নিতাই পাঠশালা ছাড়িতে বাধ্য হইল। ততদিনে তাহার বিদ্যানুরাগ আর এক পথে শাখা বিস্তার করিয়াছে। এ দেশে কবির গানের পাল্লার সে মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার সমগ্র অশিক্ষিত সম্প্রদায়ই কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে ভক্তি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি। নিতাইয়ের আসক্তি অন্যরূপ। পুরাণ-কাহিনী, কবিতার ছন্দমিল এবং উপস্থিত বুদ্ধির চমক-দেওয়া কৌতুকও তাহার ভাল লাগে।

এবং এখানে তারাশঙ্করের নিজের শিক্ষা-সংস্কৃতি ধারণাটাও খেয়াল করবেন। 'অশ্লীল' শব্দটার মধ্যে একটা বিচার ও মূল্যবোধ আছে। অর্থাৎ আত্মঅনুকারী বা সেল্ফরিকার্সিভ রকমে নিতাইয়ের টানাপোড়েনটা তারাশঙ্করের নিজেরও টানাপোড়েন – নিচুজাতের কবিয়াল হয়ে ওঠার গল্পটা হবে নিচুজাতের গল্প নাকি জাতে ওঠার গল্প। এই টানাপোড়েন থেকে মুক্ত ছিলেন না দেবকী বসুও। পরে, ঠাকুরঝির ঝাঁড়ফুকের দৃশ্যে অনেকটাই স্পষ্ট একটা অবস্থান নিচ্ছেন দেবকী বসু, এবং সেটাও উপন্যাস থেকে নড়ে গিয়ে, যে অবস্থানটা তারাশঙ্করের ওই নবজাগরণবাদী অবস্থানের সঙ্গে খুব মেলে, 'অশ্লীল' শব্দটায় যা উপস্থিত।

45
00:05:59,400 --> 00:06:03,100
A 'doam' by caste,[13]
And a porter in this station -
46
00:06:03,250 --> 00:06:08,900
He is kapi, k a p i, not a kabi.
Do you get it?

> আরে, কবি নয় রে মূর্খ, কপি। কপি। ব্যাটা জাতে ডোম, তাতে আবার ইস্টিশনের কুলি। সে কি কখনও কবি হতে পারে? কপি। ক, প-এ হসসি কার। মানে বুঝলি?

বিপ্রপদ ঠাকুরের সংলাপের এই নাটকটা দিয়েই 'কবি' উপন্যাস শুরু হয়েছিল। 'কবি' ফিল্মে সেটা এল ঠিক ৫ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে, মানে নামঘোষণা বা টাইটলের পর ২ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে চিত্রাংশ শুরুর ৩ মিনিট ২৯ সেকেন্ডের মাথায়। জাতিব্যবস্থার শরীরে এই আঘাতটার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এবং আর এক বার আমরা দেখে নিই 'কবি' উপন্যাসের সেই প্রাথমিকতম প্যারাগ্রাফটা।

> শুধু দস্তুরমত একটা বিস্ময়কর ঘটনাই নয়, রীতিমত এক সংঘটন। চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল।

ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান কি এখানে খেয়াল করতে পেরেছেন? যদি না পেরে থাকেন, তাহলে দেবাশিস হলে আপনি বকা তো খেতেনই, এমনকি আমার মুড ভাল থাকলে বলতাম, থাক শালা, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাক। তাতে অবশ্য হারগিস কর্ণপাত মানে কর্ণহাত করার ছেলেই নয় এসব। বলত, যা বলছ বলো তো। বিপ্রপদ ঠাকুরের সংলাপ আর উপন্যাসের প্রথম প্যারাগ্রাফটা পাশাপাশি আর এক বার পড়ে দেখুন তো। খুব চিত্তাকর্ষক উপাদানটা হল সেই হাইব্রিড স্পেস বা সঙ্কর ভূমি যাকে আমরা মার্জিন অফ মার্জিনে সিন্থেটিক স্পেস বা কৃত্রিম ভূমি বলে ডেকেছিলাম। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটিশের কালো বুটের কাজলকালো ছায়ায় নির্মীয়মান ঔপনিবেশিক পুঁজির মরডান (অনেক লোকেই দেখেছি, কিছুতেই র-টা ড-এর পরে বলে না, শত ধরিয়ে দিলেও, একটু ডর লাগে বলে? সেরকম বানানই লিখলাম।) হতে থাকে ভারতরাষ্ট্রে যে ঐতিহ্যটা আমরা পাচ্ছি তা আর আধুনিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট কর্তিত কিছু নয়, তারা এ

অন্যের মধ্যে প্রথম থেকেই বসে আছে, সম্রাট কণিষ্ক যার নাম দিয়েছিলেন অতিনির্ণয় বা ওভারডিটারমিনেশন। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার এই গোড়া থেকেই শোয়াশুয়িটা উপন্যাস 'কবি' ধরতে পারেনি, কিন্তু ফিল্ম 'কবি' পেরেছিল। উপন্যাস যেখানে শুধু বংশ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেই থেমে গেছিল, ফিল্মকে সেখানে ঠিক তার পাশাপাশি উল্লেখ করে দিতে হয় তার আধুনিকতার তকমা মানে চাকরির পদকেও। শুধু তার ডোম বংশ নয় কুলিগিরির চাকরিকে একই সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে সেই একই নাটককে নতুন চেহারায় হাজির করে দেয় 'কবি' ফিল্ম। একটু পরে ঠিক এটাই দেখব আমরা কবিগানের আসরে। চণ্ডীর থানের মহান্ত আর স্টেশনমাস্টার তারা পাশাপাশি চেয়ারে আসীন থাকবেন। কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা আর ঐতিহ্য দিয়ে হচ্ছে না, তাকে আধুনিকতার আশ্রয় নিতেই হচ্ছে। তার পাশাপাশি আরও একজন থাকবেন। বর্গসঙ্করের কুলতালিকায় আমাদের বাঙালিদের আর একটা নিজস্ব সংযোজন। সে কথায় পরে আসছি।

57
00:07:03,500 --> 00:07:10,800
They all went to kabigan,
In Chandi-Mother's fair.[16]

> তুমহারে বহু, তুমহারে বেটোয়া, চণ্ডীমাই কি মেলোয়া পর গইলন হ্যায়, গানা সুননে লে।

এই সংলাপটা, এবং পরবর্তী বালিয়ার পরপর সংলাপগুলি সবই তির্যক ভাবে, সেই ভাষাগত বর্গসঙ্করতারই চিহ্ন। এটা একটা বাংলা ফিল্ম, অথচ তার দর্শক নিশ্চয়ই প্রস্তুত এই হিন্দি বাক্য কটির অর্থ অনুধাবনে। এবং ফিল্মেও একাধিকবার আমরা দেখব হিন্দি কথার উত্তরে বাঙালি মানুষ ঠিকভুল হিন্দি বাংলা মিশিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছে। মানে, এক কথায় হিন্দি যে আছে সেই অস্তিত্বটা চিহ্নিত হচ্ছে এই বাস্তবতায়, এবং 'কবি' ফিল্ম সেই বাস্তবতাটাকেই হাজির করে দিচ্ছে তার নিজের শরীরেই।

61
00:07:29,900 --> 00:07:33,500
And that milkmaid, she too.

> আউর ও ছোকরিয়া গাঁওকে – গোয়ালিন।

এখানেই প্রথম উল্লেখ আসছে ঠাকুরঝির। এবং এটা লক্ষণীয় যে সে আসছে 'গোয়ালিনী' এই উল্লেখে। গোটা শাস্ত্র লোককথা উপকথা রূপকথা মিলিয়ে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক আলোচনার, ডিসকোর্সের যে অজস্র সরাসরি তির্যক এবং উপ্ত উল্লেখ বা চিহ্ন 'কবি' ফিল্মে আমরা পেতে যাচ্ছি, এটাই তার প্রথম। কবিয়াল নিতাই কয়লা বা কাজলের মত কাল, তার প্রেমিকা অন্য পুরুষের পত্নী এবং গোয়ালিনী, নিতাই তাকে ছেড়ে চলে যায় অন্য রমণীর কাছে, যাকে এই ফিল্মেই সরাসরি চন্দ্রাবলী বলে ডাকা হয়। রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর ছকটা এখানে কোনও মতেই এড়ানো যায় না। তার প্রথম সঙ্কেতটা আমরা পাচ্ছি বালিয়ার এই সংলাপে।

65
00:07:44,600 --> 00:07:47,200
My wife's sister - 'thakurjhi'?[17]

> আরে ও তো হামারে জরুকে বহিন হ্যায় রে – ও ঠাকুরঝি?

ফিল্মের মূল ছয়টি নারী চরিত্রের ভিতর তিনটি হল ঠাকুরঝি, রাজার স্ত্রী, ঠাকুরঝির শাশুড়ি বা বৃন্দাবনের মা – এদের কারুরই ব্যক্তিনাম আমরা জানতে পারি না গোটা ফিল্ম জুড়েই, একবারও উল্লিখিত হয় না। এরা সকলেই সুব্যবস্থিত নারী, পরিবারকাঠামোর মধ্যে অবস্থিত। যে দুটি নারী চরিত্রের নাম আমরা জানতে

পারি, বসন বা বসন্ত এবং নির্মলা – তারা দুজনেই ঝুমুর দলের শিল্পী মানে নর্তকী গায়িকা এবং বেশ্যা, এক কথায় পরিবারতন্ত্রের বাইরে। ছয় নম্বর চরিত্রটি আরও আকর্ষণীয়, গোটা ফিল্মে তারও নাম একবারও উল্লিখিত হয়নি, তিনি ঝুমুর দলের প্রধান, সবাই তাকে ডাকে 'মাসি' বলে। আবার একটা সম্পর্কের নাম, কিন্তু যা আর বংশলতিকা সূত্রে আহরিত নয়, কাজের সূত্রে পাতিয়ে তোলা একটা নকল আরামদায়ক পারিবারিকতার অংশ। এরকম পাতিয়ে তোলা আমরা ফিল্মেই একবার দেখব, নির্মলাকে যখন দিদি মানে বোন বলে ডাকবে নিতাই, সঙ্গে সঙ্গেই ভাইফোঁটার উল্লেখ নিয়ে আসবে মাসি, সম্পর্কের প্রত্যয়ীকরণের স্বার্থে। এই সম্পর্কের নাম দিয়ে ডাকা নারীরা সেই সময়ের সমাজে ক্ষমতার মানচিত্রে এবং পরিবারতন্ত্রে নারীর অবস্থানকে এক ভাবে চিহ্নিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতের সাপেক্ষে ঠাকুরঝির প্রেমের আবেগে ব্যক্তি অভিলাষের আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণকে আরও নাটকীয় লাগে। কিন্তু একটুও অবাস্তব হয়ে ওঠে না তার একটি ঘোষণাও। বাংলা ফিল্মে বোধহয় এখনও দুর্লভ এই বাস্তবতাবোধ যার মধ্যে আসীন অবস্থায় এই চরিত্রগুলিকে 'কবি' ফিল্মে আমরা পাই।

68
00:08:02,300 --> 00:08:09,200
(Mahadev kabial vocalizing)

মহাদেব কবিয়াল তানা নানা করছে, কবিগানের আসর শুরুর অপেক্ষায়, সম্মুখভূমিতে। এবং পশ্চাৎভূমিতে একটা জরুরি জিনিস চিহ্নিত হয়ে চলেছে। জায়গা নিয়ে রয়েছে মহান্ত। তার দুই পাশে ফাঁকা জায়গা। জনসাধারণ বসে মাটিতে এবং উচ্চাসন রয়েছে মাত্র হাতে গোনা গুটি কয়েক। দৃশ্য চলছে। মহান্ত ঠাকুরের বাঁপাশে এসে বসলেন ইস্টিশনের স্টেশনমাস্টার। মহান্ত আর স্টেশনমাস্টার দুজনেই বসলেন। এবার এলেন তৃতীয় উপস্থিতি সেই বাঙালি বাবু, যাকে একটু আগে আমরা উল্লেখ থেকে বিরত ছিলাম, তাঁর হাতে কোঁচা ও ছড়িটিও আছে। তিনি সমাগত হওয়ায় মহান্ত উঠে দাঁড়ালেন, বাবু বসলেন মহান্তের ডানপাশে, মহান্ত আবার বসলেন। সেই দুজনকে দুপাশে নিয়ে যাদেরকে মহান্ত পাত্তা দেন, পাত্তা দিতে হয় যাহাদের। ব্রিটিশের রেলের স্টেশনমাস্টার এবং ব্রিটিশের মেকলেশিক্ষার বাবু। এবং ক্ষমতার এই তিন বিন্দুই চিহ্নিত হয় তখনকার চালু ঔপনিবেশিক পুঁজির বাজারের সাপেক্ষে। বাবু ও মহান্ত আসীন হওয়া মাত্র পর্দায় আমরা দেখি পাঁপড়ভাজা বিক্রির ঝুড়ি। "এই, ফুরিয়ে গেল।" দেখা যাক, তারাশঙ্কর এই বাবু-উপস্থিতিকে উপন্যাসে কী ভাবে লিখেছিলেন।

> বাবুদলের মধ্যে একজন কলিকাতায় চাকরি করেন, ময়লা কাপড়-জামার গাদার মধ্যে তিনি ধোপদুরস্ত পাটকরা বস্ত্রের মতই শোভমান ছিলেন। চালটিও তাঁহার বেশ ভারিক্কী, তিনি খুব উঁচুদরের পায়াভারী পৃষ্ঠপোষকের মত করুণামিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন–বল কি, অ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এত গুণ! A poet! বাহবা, বাহবা রে নিতাই! তা লেগে যা রে বেটা, লেগে যা।

এ গেল অনুষ্ঠান শুরুর আগে। কবিয়াল যুদ্ধে মহাদেব কবিয়ালের সঙ্গে নিতাইয়ের জয়ের পর সেই জয়ঘোষণাও স্পষ্ট উচ্চারিত ভাবে এল ওই বাবুরই গলায়।

> চাকুরে বাবুটি করুণামিশ্রিত প্রশংসার হাসি হাসিয়া বার বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন–ইউ আর এ পোয়েট, অ্যাঁ! এ পোয়েট! ইউ আর এ পোয়েট! কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই বিনীত সপ্রশ্নভঙ্গীতে বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল–আজ্ঞে? বাবু বলিলেন–তুই তো একজন কবি রে।

এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষার যে বিকটতাটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করি আমরা, শিক্ষাশ্রমিকরা, মাস্টারমশাইরা, সেটার একটা বিজ্ঞাপনও এখানে রয়ে গেল, সেটা খেয়াল করেছেন কি? বাবু নিতাইয়ের বোঝার স্বার্থে তার ভুল ইংরিজি বাক্যকে ঠিক অনুবাদ করে শোনালেন নিতাইকে। নিতাইকে যা বললেন সেটা ঠিক, নিতাই

কবি, যা শুনে নিতাই বিমুগ্ধও হল। কিন্তু সেই 'কবি' শব্দের ইংরিজি তো 'পোয়েট' নয়। 'কবি' শব্দটা এখানে 'কবিয়াল' শব্দের সংক্ষেপ, 'কবিগান' ক্রিয়ার সঙ্গে যা সম্পৃক্ত। যা আধুনিক শহুরে বাংলার 'কবি' শব্দটায়, বা ইংরিজি 'পোয়েট' শব্দটায়, অন্তত তাদের চালু অর্থে কিছুতেই আসে না। ওই শব্দদুটি সংযুক্ত কবিতা বা পোয়েট্রির সঙ্গে, যা পড়া যায়, পাঠ করা যায়, এমনকি আবৃত্তিও করা যায়। কিন্তু, কবি বা পোয়েটকে একটা লড়াইয়ের ময়দানে, সংলাপের রূপারোপে, বিপক্ষের গানের বিপরীতে গান বেঁধে সেই গানে সুর দিয়ে বাজনা সহ গাইতে হয় না। সেই ক্রিয়াটার নামই কবিগান। সেই কবিতা আর আধুনিক শহুরে বাংলায় 'কবি' শব্দটা হল ইংরিজি 'পোয়েট' শব্দের বাংলা রূপ। তার মানে এখানে আদানপ্রদানটা ঘটছে তিনটে ভাষার মধ্যে, আধুনিক শহুরে বাংলা, পুরনো গ্রামীন বাংলা, এবং ইংরিজি। ইংরিজি শব্দের বাংলা রূপান্তরে 'কবি' শব্দটা চলে এল। একই শব্দ দুটো আলাদা ভাষায়, পুরনো গ্রামীন বাংলা এবং আধুনিক শহুরে বাংলা, দুটো আলাদা অর্থ হাজির করল। 'পোয়েট' বা তার অনুবাদে শহুরে বাংলায় 'কবি' এই শব্দে মূল অর্থটাই হারিয়ে গেল। লস্ট ইন ট্রান্সলেশনের এ এক অন্য জাতের উদাহরণ।

অথচ এই ইংরিজি শব্দে শিক্ষিত এবং ভাষায় অশিক্ষিত ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুটির হাত ধরেই আসছে নিতাইয়ের স্বীকৃতি। এবং তারাশঙ্করও তাদের জন্যেই লিখছেন যাদের মধ্যে কিছুতেই নিতাই পড়ে না। কারণ নিতাই তো ইংরিজি বর্ণমালাই জানে না। তারাশঙ্কর একাধিকবার 'পোয়েট' শব্দটাকে ইংরিজি বর্ণমালায় লিখছেন। বাংলা তো তারাই পড়ে যারা ইংরিজি জানে, মানে, জানে বলে ভাবে, আসলে বেশির ভাগ সময়ই জানে না। তারাশঙ্কর নিজেও তার পাঠককে আলাদা করে দিয়েছেন নিতাই থেকে, যেমন ওই বাবুটিও করেছিলেন। তিনি জানেন নিতাইরা কোনওদিনই ওই উপন্যাস পড়বে না। এটার মধ্যে কোনও নাটকীয়তাও নেই। এটা খুব জানা কথাও। এখানে একটা বড় পার্থক্য করে দেয় ফিল্ম মাধ্যমটা। সেই পার্থক্যের কথায় আমরা পরে আসছি। তার আগে এই জায়গাটা আর একবার খেয়াল করিয়ে দিই, এই দুই স্তরে দুবার নিতাইদের ত্যক্ত বহিষ্কৃত করে দেওয়ার শিক্ষা রাজনীতির প্রসঙ্গটা। এটাও নতুন কিছু নয়। মার্জিন অফ মার্জিনে আমরা আলোচনা করেছিলাম এরকম আর একটা দ্বিস্তর বর্জনের। বঙ্কিম তার কৃষ্ণচরিত্রে কৃষ্ণ তথা হিন্দু ঐতিহ্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু জায়গায় নৈঃশব্দ্য দিয়েছিলেন। জাতিভেদ ইত্যাদি বিষয়কে আনেন নি তাঁর আলোচনায়, কারণ যে পশ্চিমী মনের পাঠকের জন্যে তিনি লিখছিলেন, তাঁর রুচিকর লাগতে নাও পারে ওই আলোচনা। এবার পার্থ চ্যাটার্জি যখন বঙ্কিমকে আনেন তাঁর সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের আলোচনায়, সেখানে তিনি বঙ্কিমের ওই নৈঃশব্দ্যকে চিহ্নিত করেন না। তার মানে জোড়া নৈঃশব্দ্য বুকে নিয়ে গড়ে ওঠে চালু সংস্কৃতিবিদ্যার কৃষ্ণ ডিসকোর্স, কৃষ্ণ বিষয়ক আলোচনা। এটাকে আমরা এনেছিলাম আমাদের এই যুক্তির সমর্থনে যে ঐতিহ্য আর আধুনিকতা কোনও আলাদা বর্গ আর নয়, তারা এ অন্যের বুকের মধ্যেই বসে আছে, ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই। যদি কেউ এই আলোচনাটা পড়তে আগ্রহী হন, তাহলে মার্জিন অফ মার্জিনের উল্লেখ তো আগেই করেছি, এছাড়া আমার বাংলা দুটো প্রবন্ধেও এটা পাবেন, 'মার্জিন অফ মার্জিন: একটি অটেকনিকাল ভূমিকা', বা 'কলোনি যায়নি মরে আজো'। এই দুটো প্রবন্ধই পিডিএফ আকারে রাখা আছে আমার বাংলা প্রবন্ধের নেটপাতায় (http://ddts.randomink.org/bangla/index.html)। এই স্তরবিন্যস্ত নৈঃশব্দ্যকে কী ভাবে একটা ফিল্ম হিসাবে 'কবি' এড়িয়ে যেতে পারল, সেটার কথায় আসছি আমরা একটু পরেই।

সেই যে রেলের প্রসঙ্গ থেকে শরৎচন্দ্র আসতে শুরু করল, বারবার মাথায় এসেই যাচ্ছে এগুলো। এই বাবুর শরৎচন্দ্র সংস্করণটা মনে পড়ছে? এলএ পাশ করার পর ডেপুটি হওয়ার অপেক্ষারত নতুনদা? নতুনদা নামে যদি মনে নাও পড়ে, পাম্পশু থেকে নিশ্চয়ই পড়বে। এই বাবুটিরই নিকট কেউ হওয়ার সম্ভাবনা আছে নতুনদার। নভেম্বর বিপ্লবের বছরে শ্রীকান্ত ছাপা, তার বেশ কিছু বছর আগে ঘটেছিল নতুনদা উপাখ্যান, শ্রীকান্তর কিশোর বয়সে। ১৯০০ সালে শরৎচন্দ্রের বয়স ১৪, তার মানে ১৯০২ নাগাদ ধরে নিতে পারি নতুনদা মাঘের শীতে বরফশীতল নদীর জলে ডুব দিয়ে বসে কুকুরের হাত থেকে বেঁচেছিলেন, তখন যদি তার বয়স বাইশ-চব্বিশ ধরে নিই, তাহলে ১৯৩৮-এ তার বয়স প্রায় ষাট। তাহলে তারাশঙ্করের এই

বাবুটির পিতা তিনি হতেই পারেন। এবং এই বংশধারা তো আবহমান ছিলই। শ্রীকান্তর বন্ধু ইন্দ্রর দাদা নতুনদা উপাখ্যান অন্তে একটি অনাবিল অপ্রতিরোধ্য ভাঁড়ে পর্যবসিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে তো শরৎচন্দ্রের পোয়েটিক জাস্টিস, কাব্যিক ন্যায়বিচার, আদতে ঘটনাটা ছিল এই যে, যদি এমনকি ভাঁড় হয়েও থাকে, সেই ভাঁড়ই, সেইরকম ভাঁড়েরাই, ফিরে গিয়ে ডেপুটির চাকরি পাবে, ইন্দ্র জানিয়েছিল শ্রীকান্তকে। ডেপুটি মানে বোধহয় ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট, নিশ্চিত জানিনা। তার পরেই শরৎচন্দ্রের মন্তব্য ছিল, যতদূর মনে পড়ছে, অনেক বছর হয়ে গেল শ্রীকান্ত পড়েছি, যা সব সরকারি অফিসারদের ক্রিয়াকলাপ দেখছেন, তাতে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন, যে নতুনদা নিশ্চয়ই ডেপুটি হয়েছিল। নতুনদা এমনকি নিজের শরীরকে ভুলে শরীরের পোষাককে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, সজ্জাকে নিয়ে, 'কবি' ফিল্মে দেখুন পুরো সময়টা জুড়ে কী আড়ষ্ট খাড়া হয়ে বসে থাকেন বাবুটি, তার ছড়ি পোষাক সজ্জা বসার ভঙ্গী সবকিছু দিয়েই তাকে তার চারপাশ থেকে নিজেকে পৃথক করতে হবে, হবেই। নিজেকে আলাদা বলে প্রমাণ করার এই দায়ভার নিয়ে অনেক আলোচনা আছে মার্জিন অফ মার্জিনে, বা ওই দুটো প্রবন্ধে যার উল্লেখ আগেই করলাম। এই আলাদা করার মধ্যে আছে তার নিজেকে চিনতে চাওয়া, নিজের পরিচিতি বা আইডেন্টিটিকে স্পষ্ট করা, কারণ প্রথম থেকেই এই ব্যক্তিত্বের জন্ম একটা নাকচকরণের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। এই বাবু সাহেব হতে চায়, যা সে পারে না, তার নিজের আয়নায় নিজের বিম্বই তাকে প্রমাণ করে দেয়, সে অসফল, তাই সে নিজের বিম্বর প্রতিই বিতৃষ্ণ। এখান থেকেই তৈরি হয় নিজের বাইরে নিজের থেকে পৃথক একটা বিম্ব নির্মাণের চেষ্টা। কিন্তু মজাটা এই যে, এই সমস্ত বিম্ব নির্মাণের ভাঁড়ামির পরও, এই বংশধারা কিন্তু প্রবাহিত হয়ে চলে। নতুনদা ডেপুটি হয়। ভাঁড়ের জন্য যথাযোগ্য ভাঁড়িনী খোঁজা হয়, তার মধ্যে ধর্ম জাত জ্যোতিষ লোকাচার থাকে, তার মধ্যে দিয়ে চলে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সিলেক্টিভ ব্রিডিং, তৈরি হয় ছানাভাঁড়, সে আসে কবি দেখতে, এসে নিতাইকে পোয়েট বলে ডাকে।

দেবাশিসকে 'কবি' দেখাতে গিয়ে বলেছিলাম, ওই দৃশ্যে এসে, ওই দেখ তোর পূর্বপুরুষ। ওকে বংশলতিকাটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম, ওই বাবুটির ছানা পরে কভেনান্টেড অফিসার হবে, তার ছানা হবে কর্পোরেট সেক্টর, তার ছানাদের কেউ কেউ যাবে আইটি-তে, দেবাশিস যেখানে কাজ করে। দেবাশিস মোটেই গায়ে লাগায়নি কথাটা, আমার ছেলে যেমন বলত তার ছোটবেলায়, মেয়েও বলে এখন, বাবা তুমি ভীষণ আজেবাজে কথা বলো, সেটা দেবাশিসও জানে। তখন ওর অভিজ্ঞতা থেকেই দেখিয়েছিলাম, ও ভারতের আইটি সেক্টরের সবচেয়ে নামকিন প্রতিষ্ঠানটিতে কাজ করে, সেখানের অভিজ্ঞতাই, একজন কম্পুটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়র হয়ে ওর কাজ হল সারাদিন বসে থাকা, আর একটা কল-সেন্টার চালানো। বিদেশ থেকে ফোন আসবে, তাকে জানিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ, বিদেশে তৈরি বিদেশ থেকেই চালানো ওই সফটওয়ারগুলি ঠিকঠাকই চলছে। এবং সবচেয়ে রোমহর্ষক এবং বিপদসঙ্কুল (বাংলায় যাকে আমরা চ্যালেঞ্জিং বলি) কাজ হল মাঝে মাঝে কাজ করতে থাকা শেল-স্ক্রিপ্টের ডাম্প নেওয়া, এবং সেগুলি থেকে দেখে নেওয়া ফলাফল যেমন কাঙ্খিত তেমন আসছে কিনা। এবং এই ডাম্পটা ও ঠিকঠাক নিতে পারে বলেই নাকি ওর অনেক সহকর্মী ওর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকায়। এই হল কম্পুটার শিক্ষা ও কম্পুটার এনজিনিয়ারিং এর ভারতীয় ক্ষেত্রের একটি উচ্চতম নমুনা। কল সেন্টারের সাইবারকুলি ও সাইবারমজুর হওয়ার জন্যে যা দরকার ওদের ইন্টারভিউয়ে ঠিক সেইসব প্রশ্নই করা হয়, যোগ বিয়োগ ঠিক পারে কিনা, ইংরিজিতে প্রশ্ন করলে বোঝে কিনা, ইত্যাদি। চাকুরিক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সেখানে কোনও কম্পিউটার সম্পৃক্ততা নয়, প্রয়োজন পড়ে গলার জাঙ্গিয়া (কোনও অসভ্যতা করছি না, ওটা ইংরিজি টাইয়ের হিন্দুস্থানী 'কণ্ঠো কে লঙ্গোট' শব্দবন্ধের বাংলা) ব্যবহারের নিখুঁত অভ্যাস। অর্থাৎ, সেই ভাঁড়ামো সমানে চলিতেছে। এবং সিলেক্টিভ ব্রিডিং-ও। ওর জন্যে পাত্রী দেখে উচ্চঘর কন্যাপক্ষ থেকে আমি দুই পয়সা কামাতেও পারি, বড় দরকার আমার, দুই দশক হতে চলল আমার কোনও প্রোমোশন হয়নি। আইটি সেকটরের সাইবারকুলিগিরি সংক্রান্ত এই ভাঁড়ামোটা বেশ ভাল করে এসেছে আমার শেষ বইয়ে। কম্পুটার ও নেটওয়র্ক এসে যাওয়া মাত্র, পুঁজি পেল অনন্ত গতিশীলতা, শ্রম পেল অনড় স্থবিরতা, এবং বদলে গেল

গোটা শ্রম-সম্পর্কের কাঠামোটাই, তার সাপেক্ষে ভারতের আইটি সেক্টরের এই কল সেন্টার চরিত্রকে নিয়ে আমার কাটাছেঁড়াটা নিয়ে কেউ যদি আগ্রহী হন, সেটা পাবেন 'ফ্লস ও হেজেমনি' বইয়ে (http://ddts.randomink.org/flossbook/index.html) এবং বিশেষ করে তার সপ্তম অধ্যায়ে। যাকগে, আবার মূল জায়গায় ফেরত যাওয়া যাক। আর বাজে বকা নিয়ে নালিশ করার কিছু নেই, আগেই বলেছি, আমি তৃতীয় প্রজন্মের মাস্টার।

93
00:09:56,800 --> 00:10:00,090
((Disapproval - Balohari Haribol[21]))
Silence, silence, order, order.[22]

সাবটাইটলের এসআরটি ফাইলের গোড়াতেই বলে দেওয়া ছিল, দুই ব্রাকেটের মধ্যে, (()), দেওয়া আছে পরিপ্রেক্ষিত সংক্রান্ত মন্তব্য, যেমন লোটনদাস কবিয়ালের না-আসার সংবাদে তৈরি হওয়া বিরক্তির রব "বলহরি হরিবোল", যা আবার শবযাত্রার স্লোগানও বটে। তারাশঙ্করের ভাষায়, "অর্থাৎ মেলাটির শবযাত্রা ঘোষণা করিয়া দিল।" কিন্তু উপন্যাসে ছিল এই সংক্রান্ত আর একটা মজার উপাদান। ঝুমুর গানের আসরে, যে ঝুমুর হল কবিগানেরই আরও অনেক প্রাকৃত, 'অশ্লীল' একটি সংস্করণ, "হরিবোল" ছিল প্রশংসাও।

> পয়সা-আনি-দুয়ানি-সিকি-আধুলিতে প্যালার থালাটা ততক্ষণে একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে, গোটা টাকাও পড়িয়াছে দুই-তিনটা। গান শেষ হইতেই শ্রোতারা হরিবোল দিয়া উঠিল–হরি হরি বল ভাই। বিচিত্র, ইহাই উহাদের সাধুবাদ!

ঝুমুরের মধ্যেই গোড়া থেকেই এই বিকৃতি বা সাবভারশনটা আছে। চালু সমাজ ডিসকোর্সের শোকবার্তাটা এখানে একটা সাধুবাদ। তারাশঙ্কর উপন্যাসে ঝুমুরের একটা আলগা সংজ্ঞা দিয়েছেন। এবং সেই বিবৃতির মধ্যেও থাকে লেখকের সেই বিষয়ী-সংস্থান যা ঝুমুর বলে জিনিসটাকে চেনে, কিন্তু কোনও মতেই তার অংশ নয়, তাকে সমর্থনও করে না।

> বহু পূর্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখান, কাল সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে, কেহ বায়না না করিলেও সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পাতিয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দেয়। মেয়েরা নাচে, গায়–অশ্লীল গান। ভনভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়।

অথচ, এই ঝুমুর দলের বেশ্যা বসনই, উপন্যাসের শিল্পের টানে, জীবনের ঘটনার মোচড়ের অভিজ্ঞতাতেই হয়ত, হয়ে দাঁড়ায় উপন্যাসের মূল একটি চরিত্র। শিল্প তার নিজের জোরেই, প্রতিটি ক্ষেত্রেই, শিল্পীকে অতিক্রম করে যায়। যাই হোক, চলে আসা যাক ফিল্মের এই জায়গার অন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটার বিষয়ে।

> সাইলেন্স, সাইলেন্স। অর্ডার, অর্ডার।

উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত আড়ষ্ট ভাবে বসে ডানে বাঁয়ে কলের পুতুলের মত মাথা-নাড়ছিলেন। এবং যে যখন কথা বলছে তখন তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। ওইটুকু দূরত্বে দৃষ্টিকোণ বদলাতে বোধহয় অতটা ঘাড় বেঁকানোর দরকার পড়ে না, শুধু চোখ নড়িয়েই দৃশ্যবস্তুর বদলকে ধরা যায়, কিন্তু তাহলে নাড়াচ্ছিলেন কেন? চারপাশটার সঙ্গে তার অনভ্যস্ততার দূরত্বটাকে প্রকট করতে? এবার বাবুটি উঠে দাঁড়ালেন এবং বিচারপতির হাতুড়ির মত করে, বোধহয়, হাতের ছড়িটিকে নাড়াতে নাড়াতে বললেন তার কথাটি। সেই কথাটি যা নিতাইরা বোঝে না। বোঝার দরকারও পড়ে না নিতাইদের। খুব প্রয়োজন পড়লে তারা জিগেশ করে নেন, এবং বাবুরা তখন ভুল অনুবাদ করে সেটা শুনিয়ে দেন। পুরো দৃশ্যটা জুড়ে, সেই মহাদেব কবিয়ালের তানানানা থেকে শুরু করে, বাবুটির ভাঁড়ামোকে দেবকী বসু পুরো একটা চিত্রগত গঠনে

দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর গোটা আচরণটাকে পর্যবসিত করেছেন কিছু ভঙ্গীতে, যা শ্রবণে এবং দৃষ্টিতে অনুভব করে নেওয়া যায়, তাতেই তার অর্থটা বোধগম্য হয়ে যায়, ভাষার যেখানে আর প্রয়োজন পড়ে না। মাথায় ভেবে দেখুন, বাবুটির গোটা ক্রিয়াটি কিছু ধ্বনি ও চিত্রে বোধযোগ্য, সেটা ভাষার অতীত, তিনি যে ভাষাতেই চেঁচান না কেন, 'সাইলেন্স' না বলে 'সিঁলস' বা 'খামোশ' বা 'সিলেনজিও' বলে চেঁচাতেন, ওই ভঙ্গীগুলো একই রেখে, তাহলেও গোটা বিষয়টা থাকত একই।

দেবকী বসুর কবি, ১৯৪৯ – দ্বিতীয় প্রবাহ

অধ্যায় বোঝাতে 'প্রবাহ' ব্যবহার আমি কখনও করিনি। তাই বেড়ে লাগছে, শব্দ ব্যবহার করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলাম, জীবনে প্রথম কোনও একটা শব্দ ব্যবহার করছি এই মজা এখন দুর্লভের চেয়েও বেশি। সত্যিই প্রথম অংশটা চলছিল একটা প্রবাহের মত। লেখাটার পরিকল্পনাটাও গজিয়ে উঠল সাবটাইটল আর নোটস ফাইল শেষ হওয়ার পর, নানা জনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। তারপরও ঈপ্সিতা না খোঁচালে শুরুও হত না। বেশ চলছিল। লিখতেও বেশ লাগছিল। এর মধ্যে একটা ছেদ এল শারীরিক ক্লান্তিতে। আমি রসিকতা করেও বলি, আমার ক্লান্তি হয় না, বংশটা তো দাস। কিন্তু দাসও তো বুড়ো হয়। খুব খুব ক্লান্তি হচ্ছিল। প্রথমে ভাবলাম ক্লান্তিটা স্নায়বিক, একটা দিন গোটাটা কাটালাম নানা কিছু রান্নাটান্না করে। মেয়েটা পুরো মাংসাষী হয়েছে, যেদিন পাড়ার যে বাড়িতে মাংস রান্না হয়, সেখানেই খেয়ে আসে। ওর বাবাই যে ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ মাংসরাঁধুনি এটা ওকে আরও একবার প্রত্যয়িত করার প্রয়োজন ছিল। তারপর দেখলাম ক্লান্তিটা তার চেয়েও গভীর, একদিন রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে খাট থেকে পড়েই গেলাম। উঠে আবার শুয়েছি যখন ডান হাতের কনুইয়ে তীব্র যন্ত্রণা করছে, ভয় লাগছে আবার হাড় ভাঙল কিনা, কিন্তু তার মধ্যেই ফের সাড়হীন ঘুমিয়ে পড়লাম। একবার ভাবলাম, লেখাটা আর লিখব না, অসমাপ্ত কাজ হাতে থাকলে যেমন হয়, মেজাজ শুধুই খিঁচড়ে যেতে থাকে, তাও পারছিলাম না ফের হাত দেওয়ার উদ্যমটা সংগ্রহ করতে। আর ব্যাটা দেবাশিসও কোনও প্রতিবার্তা (বাংলায় ফিডব্যাক) পাঠাচ্ছিল না। সেই সাতই নভেম্বর ভোরের পর ছয়দিন আর লিখিইনি। কাল ফের উদ্যমটা ফিরে এল সেঁজুতি খোঁচানোয়, ওর একটা লেখার কাজে লাগতে পারে, তাই ফোনে বলল, কী হল, তুমি আর লিখছো না কেন? ছেলেপিলেদের অবস্থা কী? আঠারই, মানে সামনের বেস্পতিবার বিয়ে, এখনও অন্য জিনিসে মনযোগ দিয়ে যাচ্ছে। ছি, ছিছি। বিয়ে বস্তুটা কবে থেকে এমন এলেবেলে হয়ে গেল কে জানে, আরও তার উপরে এই প্রথম ও বিয়ে করছে। কিন্তু উদ্যমটা সত্যিই ফেরত এল। তাই, আসুন দ্বিতীয় প্রবাহে ঢোকা যাক। কিন্তু মাথায় রাখবেন, এটা 'কবি' ফিল্মের কোনও মূল্যায়ন নয়, সমালোচনা তো নয়ই। 'কবি' ফিল্ম দেখাটা আমি নামক ব্যক্তিকে, তার ব্যক্তি অনুভূতিকে কোন কোন জায়গায় আক্রমণ করেছিল, তার একটা তালিকা বলা যেতে পারে। সেই তালিকাও আবার কোনও সচেতন যত্ন নিয়ে চয়ন করা হয়নি, চালিয়ে দেখতে থাকছি, যে জায়গায় কিছু মাথায় আসছে, থামিয়ে লিখে নিচ্ছি।

আমরা ছেড়েছিলাম বাবুর উপন্যাস-রূপ আর চলচ্চিত্র-রূপে পার্থক্যের প্রশ্নে। খেয়াল করেছেন কী, অনুবাদ ভুল অনুবাদ প্রতি-অনুবাদের গোটা চক্করটা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে 'কবি' ফিল্ম, যা 'কবি' উপন্যাস পারেনি। উপন্যাস ভাষা-নির্ভর হওয়াতে সেখানে কোন পাঠক উপন্যাসটা পড়ছে, কার জন্য তারাশঙ্কর লিখছেন, এই নির্বাচনটা সক্রিয় ছিল। ভাষাই ঠিক করে দিচ্ছিল, কে লেখাটা পড়বে – ইংরিজি বর্ণমালা এবং ভাষা যার কাছে অবোধ্য নয়। কিন্তু ফিল্মে বাবুর মাঝ-ফ্রেমে বসে থাকা এবং বারবার দুদিকে নাচপুতুলের মত করে তাকাতে থাকা, তারপরে উঠে দাঁড়ানো এবং কথা বলে ওঠা, এই গোটাটা মিলে তৈরি করল একটা ভঙ্গী। যে ভঙ্গীটা যে কোনও দর্শকের কাছেই অত্যন্ত সুবোধ্য, সেখানে ভাষাটা কোনও অন্তরালই নয় আর। এই ভঙ্গীটা, এবং ভঙ্গীটাকে প্রাকৃত বাঙালি কী ভাবে চেনে, কী ভাবে বোঝে, এটা অনেক অজস্র অসংখ্য বার এসেছে বাংলা সাহিত্যে, কিন্তু আমার তো কিছু স্থির শ্মশানভূমির বাধ্যতা আছেই। সেই 'ইছামতী' থেকেই তোলা যাক, যে উপন্যাসটা আজ পর্যন্ত একবারও হয়নি যে আমি যে কোনও পাতা একবারও পড়েছি, অথচ

রক্তক্ষরণ হয়নি অস্তিত্বের গভীরে কোথাও। আমি যে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, সেই উদ্ধৃতিটুকু দিতে দিতেও, উপন্যাস থেকে এই লেখায় টুকতে টুকতেও আমার মধ্যে কী একটা হচ্ছে, পড়তেও ভাল লাগছে। বেশ কয়েক লাইন তোলা যাক 'ইছামতী' থেকে।

> তিলু হেসে বললে–এই খোকা, তোর শম্ভুদাদা কেমন ইংরিজি বলে রে?
> –ইট্ সেইস্ট মাট্ ফুট্–ইট সুনটু-ফুট-ফিট্ –
> ভবানী বললে–বা রে! কখন শিখলি এত?
> টুলু বললে–শুনে শিখিচি। বলে, তাই শুনি কিনা। যা বলে, সেরকম বলি।
> ভবানী বললে–সত্যি, ঠিক ইংরিজি শিখেছে দ্যাখো। কেমন বলচে।
> নিলু বললে–সত্যি, ঠিক বলচে তো!
> তিনজনেই খুব খুশি হোলো খোকার বুদ্ধি দেখে। খোকা উৎসাহ পেয়ে বললে–আমি আরো জানি, বলবো বাবা? সিট্ এ হিপ্-সিট্-ফুট্-এপট্-আই-মাই–ও বাবা এ দুটো কথা খুব বলে আই আর মাই–সত্যি বলছি বাবা–
> নিলু অবাক হয়ে ভাবলে–কী আশ্চর্য বুদ্ধিমান তাদের খোকা!

এর মধ্যে একজন, ভবানী নিজে অত্যন্ত শিক্ষিত একটি মানুষ, ভারতীয় শাস্ত্র ও তত্ত্বের ডিসকোর্সে, আলোচনায়। এবং নিলুর শেষ বিস্ময়টা খেয়াল করুন, "কী আশ্চর্য।" এই ওয়ান্ডার বা বিস্ময়টা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এবং এটা বোধহয় আজও অব্দি একটা ক্রিয়াশীল বিস্ময়। আনন্দ-সাহিত্যের, মানে আনন্দ পাবলিশার্সের ছাপা সাহিত্যের, একটা ব্যাপক অংশে, এত ইংরিজি বাক্যের প্রাদুর্ভাব কেন, এবং একই ঘটনা পুনরাবৃত্ত হয় কেন বাংলা ফিল্মে সিরিয়ালে – আমার ধারণা, এই বিস্ময় আজও ক্রিয়াশীল। খুব ঝিনচাক একটা লোকের, বা তার বউয়ের, বা ছেলেমেয়ের বিশ্বাসযোগ্যতাই নির্মিত হয় এই ইংরিজি প্রয়োগে, কারণে এবং অকারণে। এবং 'অকারণ' শব্দটা এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ 'কারণ' শব্দটার সঙ্গে। আমি দেখেছি সিরিয়ালগুলো সিনেমাগুলো চলার সময়ে ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষদেরও কোনও অসুবিধা হয় না, তার মানে কাহিনীর শরীরে এগুলো কোনও অর্থপূর্ণ উপাদানই নয়। বা সম্পূর্ণ ইংরিজি-অজ্ঞ মানুষকেও কোনও আনন্দ-সাহিত্য পড়ার পর প্রশ্ন করে দেখেছি, তার বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি। এগুলি প্রয়োগ হয়ে চলে একদম সেই বিস্ময়ই উৎপাদনের জন্য, নিলুর যা হত। এগুলো দেখে একটা বিকৃত আনন্দও হয়, ওই সাহিত্যে বা সিরিয়ালে এই প্রয়োগে – সচরাচর এত খারাপ ইংরিজি থাকে সেগুলো যে একটা আরাম হয়, দে দে রে, ইংরেজদের তো নিজে থেকে তাড়াতে পারিনি আমরা, দে ব্যাটাদের ভাষাকেই ধর্ষণ করে দে।

দেবকী বসু 'কবি' চলচ্চিত্রে এই ভঙ্গীটাকেই অনুবাদ করে দিচ্ছেন ফিল্মের ভাষায়। এবং তাই করে উপন্যাসের লেখক পাঠকের নির্বাচিত চক্রের চক্কর থেকে বেরিয়ে আসছেন। 'বেদের মেয়ে জোছনা' বা 'শত্রু' বা 'চ্যালেঞ্জ' জাতীয় ফিল্মে যখন কোনও বড়লোকের বেটাবেটি বা কোনও অফিসার ইংরিজি বলে, এই ভঙ্গীটাই সেখানে পাঠ করে দর্শক, চরিত্রের পোষাক ধরনধারণ সব কিছু মিলিয়ে। এবং তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাস আর আমাদের উদাহরণের এই 'ইছামতী' উপন্যাস দুটোতেই কিন্তু চক্করটা চালু আছে। 'ইছামতী' উপন্যাসে প্রচুর কথোপকথন আছে সরাসরি ইংরিজিতে, ভাষায় ও বর্ণমালায়, এমনকি কোনও অনুবাদও পাশাপাশি দেওয়া নেই তার বহু জায়গাতেই। আমি জানিনা, আপনাদের কী হয়, আমার গোড়া থেকেই একটা তীব্র বিরক্তি হত এতে, এই ইংরিজি প্রয়োগে। স্কুলের উঁচুর দিকে উঠে যখন প্রথম এলিয়টের কবিতায় সরাসরি সংস্কৃত ও গ্রীক অক্ষরের ব্যবহার প্রথম যেবার দেখেছিলাম, একটা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম, আজও স্পষ্ট মনে আছে। যদিও সেটা অর্থহীন, এলিয়টের ওই ব্যবহার একদম অন্য একটা ব্যাপারকে হাজির করে। যাই হোক, দরকারি জায়গাটা এই যে, নিতাইদের আর বাবুর বক্তব্যকে ভাষা হিসাবে বুঝতে হয়না 'কবি' চলচ্চিত্রে, তাই বোঝার ভুলও হয়না, তাই সেই বোঝার ভুল অপনোদন করতে ভুল প্রতি-অনুবাদও আর প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে না। ভাষাগত অর্থের জায়গায় প্রবেশ না করেই বাবু তার

সমস্ত ক্ষমতার ঔদ্ধত্য নিয়ে চিহ্নিত হয়ে যান।

102
00:10:39,100 --> 00:10:41,390
'Absolute cowards, cowards'.[25]

অ্যাবসলিউটলি কাওয়ার্ডস, কাওয়ার্ডস কোথাকারের।

এবারে আর কিছুই আলোচনা করার নেই। শুধু শেষ আলোচনাটার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

105
00:10:50,300 --> 00:10:52,300
What is a 'madel', didi?[26]
106
00:10:52,600 --> 00:10:56,400
A piece of metal, with engraved name.

ম্যাডেল কী দিদি, ম্যাডেল?
পদুক লো পদুক। তাতে নাম ন্যাকা থাকবে।

এবার এল ভারি আকর্ষণীয় একটা জায়গা। বাবু ও ক্ষমতার জগতকে কেন্দ্র করে ইংরিজি শব্দ কত কত স্তরে কত রকমে অনিংরিজিতে পর্যবসিত হতে পারে তার একটা ভারি চমৎকার উদাহরণ। এবং এটা চলেছে গোটা 'কবি' চলচ্চিত্র জুড়ে। এই মেডেল নামক শব্দ ও পরিপ্রেক্ষিতটা এখন বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলবে, এবং আবারও ফেরত আসবে চলচ্চিত্রের একদম শেষ দিকে। যখন একদিকে বসনের মৃত্যু হচ্ছে, এবং একটা প্রতিযোগিতায় সোনার মেডেল জয়ের জন্য অংশগ্রহণের নিমন্ত্রণ আসছে নিতাইয়ের কাছে। চলচ্চিত্রের এই জায়গায় যেমন স্টেশনমাস্টার, রাজনের বৌ, ঠাকুরঝি, রাজন, এবং নিতাই, পরের বার এই 'মেডেল' শব্দটা তার বিভিন্ন উচ্চারণভেদে উচ্চারিত হবে মহাদেব কবিয়াল, বেহালাদার, মাসি, বসন, আমন্ত্রণকর্তা এবং নিতাইয়ের মুখ দিয়ে। এবং মজাটা এই যে, যে উচ্চারণটা এখানে গৃহীত হচ্ছে, স্টেশনমাস্টার জাতীয় মানুষদের মুখ দিয়ে, সেটা মূল শব্দটার ইংরিজি উচ্চারণ নয় আদৌ, একটা স্পষ্ট বাংলাকরণ রয়ে যাচ্ছে তাতে, ম-এ একার, ড-এ একার, ল – এই উচ্চারণে। অর্থাৎ এটাই শিক্ষিত বাঙালির কাছে ইংরিজি শব্দটার আকার। এই পার্থক্য রয়েছে অজস্র শব্দের লোক ব্যবহারে, যেমন বাস-স্টপেজ, যা, বোধহয় কোনও ইংরিজি শব্দই নয়। শিক্ষিত বাঙালির জনপ্রিয় ব্যবহারে 'বাসস্টপ' শব্দটার ওই আকার দাঁড়িয়েছে। ঠিক তেমনি 'মেডেল' এখানে গৃহীত-সঠিক। এবার, সেই গৃহীত-সঠিকের থেকে কতটা দূরবর্তী কারুর উচ্চারণ তার ভিত্তিতে তার সামাজিক অবস্থানটাও চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে গোটা চলচ্চিত্র জুড়েই। যেমন সবচেয়ে স্পষ্ট ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণটা আসছে ঠাকুরঝির কাছ থেকে। সামাজিক অবস্থানটা ভাবুন। গ্রাম, পরিবারতন্ত্র, নারী। তার চেয়ে সঠিক উচ্চারণ করেন, 'মেডেল' নামক সেই স্টেশনমাস্টার উচ্চারণের নিকটতর, মাসি। যা স্বাভাবিক, শ্রমের বাজারের অভ্যস্ততা। এবং বেহালাদার তার চেয়েও সঠিক, কারণ সে ভুয়োদর্শী, সত্যই নানা ঘাটের জল খেয়ে এসেছে সে, এবং একই সঙ্গে পুরুষ। ওই একই জায়গা থেকেই বোধহয়, গ্রামের ডোমনন্দন নিতাইয়ের উচ্চারণের সঙ্গেও তার একটা পার্থক্য থাকে। হয়ত এতটা সত্যিই সচেতন নির্মাণ নাও হতে পারে, কিন্তু হতেও পারে। কারণ এই গোটা 'মেডেল' পরিপ্রেক্ষিতটাই চলচ্চিত্রের নিজস্ব, উপন্যাসে এটা আদৌ নেই। চলচ্চিত্রের এই জায়গায় এসে এটা শুরু হল, চলবে একদম শেষ অব্দি, কাহিনীধারার মূল একটা প্রবাহ। তাই সেটা অনেক ভেবেচিন্তেই প্রযুক্ত হয়েছিল, এটাই স্বাভাবিক। তারাশঙ্করের লেখায় ভাষাভিত্তিক এই অবস্থান এবং বর্গসঙ্করতার কিছু ভাবনার ভ্রূণ ছিল, কিন্তু যে আকারে সেটা উপস্থিত হল চলচ্চিত্রে তার সঙ্গে তার তুলনা করাই যায় না। আমরা সেই কথায় পরে আসছি, বালিয়ার প্রসঙ্গে। এই মেডেল-পদুক পরিপ্রেক্ষিতে আর দু-একটা কথা যোগ করে নেওয়া যাক।

খেয়াল করুন, 'মেডেল' উচ্চারণটাকে যদি আমরা সেই অর্থে বাঙালি-সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলে, ঠাকুরঝি সেখান থেকেও নড়ে গেল, হয়ে গেল 'ম্যাডেল'। এবং সেই বিদেশী ধারণাকে দেশী ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজনের বৌ বলল, 'পদুক'। যা একই সঙ্গে আর একটা পুরনো শব্দের থেকে নড়ে যাওয়া। 'পদক' একটি সংস্কৃত শব্দ, শিক্ষিত তৎসম বাঙলায় এর ব্যবহার বহুল, কিন্তু এই তদ্ভব আকারটা তার থেকে পৃথক। একসময়ের শাসকদের হাত ধরে এসেছিল 'পদক', বদলে তার অপভ্রংশ হয়ে গেল 'পদুক'। নতুনতর শাসকের হাত ধরে এল 'মেডেল', সেটাও গেল বদলে। আমার ভারি মজা লেগেছিল এই কথোপকথনটায়। মনে পড়ে গিয়েছিল, একাদশ শতকে লেখা কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' সংস্কৃত নাটকে 'আর্যপুত্র' বদলে অপভ্রংশ বাচনে 'অজ্জউত্ত' হয়ে যাওয়া, নাটকে নটীর প্রথম সংলাপেই ছিল। মুরারিমোহন সেন তাঁর অনুবাদের সঙ্গে দেওয়া মূল সংস্কৃত নাটকে প্রতিটি অমন অপভ্রংশ সংলাপের নিচেই ব্রাকেটে সঠিক সংস্কৃত শব্দগুলো দিয়ে দিয়েছিলেন, মনে আছে। ব্রাকেটের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ওগুলো দেখতে দেখতে জ্যান্ত ইতিহাসের শরীরে ঘটতে থাকা বদলের একটা ছাপ পেয়েছিলাম, মনে আছে। এখানে 'কবি' চলচ্চিত্রে ঠিক তাই ঘটে। দাসী ও শূদ্রদের অপভ্রংশে ছড়িয়ে যেতে থাকে তার নানা বিভিন্ন আকারে মূল ইংরিজি শব্দটি। এই বাস্তবকে ধরে উঠতে পারে চলচ্চিত্রটি, কোনও বাড়তি মন্তব্য না করেই।

148
00:14:58,090 --> 00:15:07,800
The son of the wise 'doam'(31)
Started getting stupid

সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।

ঠিক আগের দৃশ্যই ছিল নিচু-জাতের দুজন মানুষ, মুচি ও ডোম, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে। আর তার পরের দৃশ্যই হল এই জাত তুলেই গালি দিচ্ছে মহাদেব কবিয়াল। এবং এখানে দেবকী বসু একটা অদ্ভুত সুযোগ পেয়ে গেলেন, পড়ে পাওয়া আঠারো আনার মত, একটা দুষ্প্রাপ্য সুযোগ। জাতপাতের স্তরে একটা জ্যান্ত যুদ্ধ সেটা ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই এসে গেছে আলোচনা বা ডিসকোর্সের স্তরে, কবিগানের দৌলতে। এবং সেই আলোচনায় স্থানান্তরিত কবিগান-যুদ্ধের অনেকগুলো উপাদানই হল যে মাধ্যমটি দেবকী বসু নির্মাণ করছেন তার সঙ্গে এক। কবিগানের মধ্যেই আছে গান, নাচ, অভিনয়ের কিছু উপাদান, এবং কোথাও কোথাও ভ্রূণাকার কাহিনীসূত্র। এই কবিগানটার মধ্যেও ভাবুন, যখনই মহাদেব কবিয়াল গরুড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ, এবং নিতাই মশার ভূমিকায়, তার মধ্যেই চলে আসছে একটা আলগা কাহিনীসূত্র যা উপ্ত রকমে ব্যবহার করছে রামায়ণের কাহিনীসূত্রর একটা ছায়াকে। ফিল্মে মনোরঞ্জনের জন্যে নাচ-গান যোগ করা হয়, আমরা রোজই দেখি। আর এখানে, কাহিনীর একটা মূল উপাদান, জাতপাতের যুদ্ধ, ইতিমধ্যেই স্থানান্তরিত হয়েছে কবিগানের পালায়, যে কবিগানের মধ্যেই রয়েছে সামাজিক ভাবে পরীক্ষিত ও উত্তীর্ণ মনোরঞ্জনের নানা উপাদান। এবং সেটা কাহিনীর মূল ধারাটিকে, জাতপাতের যুদ্ধকে একটুও দুর্বল করছে না, বরং সংঘাতটাকে এনে দিচ্ছে সরাসরি প্রদর্শনীমঞ্চের উপর, প্রদর্শনযোগ্যতায়, শিল্পমাধ্যমে অনুবাদ করে। এই জাতপাতের সংঘাতের জায়গাটা, একটু অন্য চেহারায়, এই কবিগানের আকারেই উপস্থিত হয়েছিল আর একটা জনপ্রিয় বাঙলা চলচ্চিত্রে, 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'। মনে করুন, 'খ্রীষ্ট আর কৃষ্টে কিছু ফারাক নাই রে ভাই' কবিগানের সেই তীব্রতা। দেবকী বসুর সুযোগ বলতে এটাকেই বোঝাচ্ছি যে সামাজিক বাস্তবতার চিত্রায়ন করতে গিয়ে নাচ-গান ইত্যাদিতে সরে যাওয়া নয়, সেই নাচ-গানের মধ্যে দিয়েই সেটা উপস্থিত হচ্ছে। সরাসরি এর রাজনৈতিক প্রয়োগের একটা উদাহরণ নিবারণ পণ্ডিত। গণনাট্যের গানে তার জনপ্রিয় হয়ে ওঠা সেই 'পাপী তো কৃষ্ণ বলে না' অনেকদিন পরে ফের শুনেছিলাম দোহারের গানে।

মহাদেব কবিয়ালের গানে এর পরবর্তী অংশে যে প্রসঙ্গগুলি এসেছে তার দু-একটা এখানে উল্লেখ করে রাখি। এর পরেই মহাদেব কবিয়াল উল্লেখ করবে নিতাইয়ের জাত-ব্যবসার কথা। সেটা বলতে এখানে

চুরি-ডাকাতির কথা তুলেছে মহাদেব। যেমন নিতাইয়ের বাবার কথা বলেছে সে, সিঁদ কেটে বাড়ি বাড়ি চুরি করত, বা তার ঠ্যাঙাড়ে ঠাকুর্দার কথা, এবং তার মায়ের বাবার কথাও যে কিনা দ্বীপান্তরে মরেছে। এছাড়া নানা জায়গায়, ডোমদের আর একটা পেশা ছিল শ্মশানে। ডোমদের এই ধরনের পেশাগুলির একটা ইতিহাস ছিল। বাংলার সামাজিক ইতিহাস নিয়ে কোনও খুব স্পষ্ট মতামত দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু নানা সময় যা কিছু শুনেছি বা পড়েছি, তার থেকে এইটুকু মাথায় আসছে যে, বোধহয় ব্রিটিশ আমলে ডোমদের এইসব অপরাধ ও মৃত্যুকেন্দ্রিক পেশার সূচনা প্রাকব্রিটিশ বাংলায়। সেখানে ডোমরা ছিল একটি যোদ্ধা জাতি। বিভিন্ন রাজার হয়ে যুদ্ধ করত এই ডোমরাই। এই ইতিহাসই বোধহয় ধরা আছে ওই ছেলেভোলানো ছড়ায়: "আগে ডোম, বাগে ডোম, ঘোড়াডোম সাজে"। আগে এবং পিছনে ডোম সৈন্যদের নিয়ে, অশ্বারোহী ডোম যোদ্ধাদের নিয়ে, "ঢাক মেঘর ঘাঘর" ইত্যাদিতে যুদ্ধের বাজনা বাজাতে বাজাতে যুদ্ধে যেতেন তখনকার বাংলার রাজারা। তারপর রুল ব্রিটানিয়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপে, রাজশেখরের ভাষায়, "আন্ডার দি সুদিং ইনফ্লুয়েন্স অফ দি বিগ রড", রাজারা ভ্যানিশ, রাজায় রাজায় যুদ্ধও ভ্যানিশ। ফলত বহু জায়গাতেই ডোমরা তাদের যুদ্ধবিদ্যা সম্পৃক্ততা থেকে সহজেই রত হল চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি পেশায়। ডোমদের যেটা পোষাকি নাম, 'রাজবংশী' বা 'বীরবংশী', যার একটি মহাদেব কবিয়ালের গানে এর পরেই এসেছে, অন্যটিও এসেছে চলচ্চিত্রের অন্যত্র, তারও শিকড়টা তাই রাজা বা বীর, যা এদের সেই লুপ্ত হয়ে যাওয়া পেশাকেই চিহ্নিত করে।

161
00:16:16,850 --> 00:16:19,500
Pointsman - go to your place.

পয়েন্টসম্যান, যাও নিজের জায়গায়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্ত রকমে পরিবর্তমান বাস্তবতার একটা চিত্র 'কবি' চলচ্চিত্র, 'কবি' উপন্যাস থেকে আরও অনেক বেশি যুগোপযোগী রকমে, যেখানে রাজনের জাতিগত পরিচিতি 'মুচি' আমরা আগেই স্টেশনমাস্টারের কাছ থেকেই শুনেছি। তাই স্টেশনমাস্টার ভালই অবগত আছেন সেটা, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠছে এই পেশাগত পরিচিতি। এই পেশাগত পরিচিতি এসেছে আধুনিকতার শরীর বেয়ে, রেলতন্ত্রের একটি উপাদান এই পরিচিতি, ঐতিহ্যগত পরিচিতিকে যা ছাপিয়ে যাচ্ছে। কারণ ক্ষমতার প্রকরণের শরীরেও ছায়া ফেলছে এই আধুনিকতা। স্টেশনমাস্টার জানেন, রেলতন্ত্রের অভ্যন্তরে রেলতন্ত্রের নিজস্ব ক্রমবদ্ধতার, হায়েরার্কির ভিতর থেকে আসা আদেশই সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল, যা ঐতিহ্যের সামাজিক আদেশের চেয়ে ইতিমধ্যেই বেশি সক্রিয়। যদি খ্যাপাটে রাজনকে চুপ করিয়ে বসাতেই হয়, শান্ত করতেই হয়, তাহলে রেলতন্ত্রের অভ্যস্ত আদেশই, যেখানে উচ্চতর স্টেশনমাস্টারের আদেশ পয়েন্টসম্যানকে মানতেই হয়, কাজ করবে, এটা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন স্টেশনমাস্টার।

167
00:16:53,500 --> 00:16:59,400
Coming from such a caste,
You want to sing kabi?
168
00:16:59,600 --> 00:17:02,400
Boy, want to be a kabi?
169
00:17:03,500 --> 00:17:05,800
Coming from such a caste,
You want to sing kabi?
170

00:17:06,300 --> 00:17:10,100
Like legendary Ratnakar[34]
A carp in a prawn's womb.

> ওরে সেই বংশের ছেলে ব্যাটা,
> কবি গাইবি তুই।
>
> কী রে ব্যাটা, কবি গাইবি, অ্যাঁ?
>
> ওরে সেই বংশের ছেলে ব্যাটা,
> কবি গাইবি তুই।
> ব্যাটা ডোমের ছেলে রত্নাকর,
> চিংড়ির পোনা রুই।

যতদূর সম্ভব তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ কাজ, 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রাম'-এও বোধহয় ছিল না জাতপাতের রাজনীতির এত তীব্র এবং কুৎসিত প্রকাশ, যা এই কবিগানে দেখি আমরা। একদম সেই সম্ভাব্য বিস্ফোরণটাকে, জাতপাতের ক্রমবদ্ধতার আবহমান সমাজে যা ঘটতে যাচ্ছে। এবং এই প্রকাশের বিশেষতাটা কোথায়, কোথায় একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব চেহারা এটা পেয়ে গেল 'কবি' চলচ্চিত্রে সেই প্রসঙ্গটা বুঝতে আমাদের ১ মিনিট ২০ সেকেন্ড পিছিয়ে ১৫ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে যেতে হবে, যেখানে রাজা উঠে পড়ছে, এবং তাকে নিরস্ত করছে স্টেশনমাস্টার।

155
00:15:50,600 --> 00:15:56,400
See, how mean and abusive -
See how vulgar his dance is.

> বাবুমশাই, বাবুমশাই, দেখুন, দেখুন, ব্যাটা কিরকম অন্যায্য গালাগাল দিচ্ছে দেখুন।
> আবার, আবার দেখুন, কিরকম করে নাচছে।

খেয়াল করুন, চলচ্চিত্র মাধ্যমের বাড়তি জোরের জায়গাটা, এবং কবিয়ালের সঙ্গে তার উপাদানের একদেশতার বাড়তি জোর যেটা দেবকী বসু পেয়ে গিয়েছিলেন, যা তারাশঙ্কর পাননি। রাজন যখন বাবুমশাইকে দেখায় যা সে দেখাতে চাইছে, একই সঙ্গে সে সেটা আমাদেরও দেখায়, আমরাও দেখি সেই একই জিনিস কবিগানের আসর যা দেখছে। প্রদর্শন এবং প্রদর্শনী এক হয়। তারাশঙ্কর যখন দেবু ঘোষ ও ছিরু পালের লড়াই, রক্তাক্ততাকেও বিবৃত করেন, সেটা থাকে বিবরণ, 'গণদেবতা' উপন্যাসে যেমন, কিন্তু এখানে আমরা সেটা সরাসরি দেখছি। যখন বলেছিলাম এই 'কবি' চলচ্চিত্রের পড়ে পাওয়া আঠারো আনার কথা, এটার কথাই বলেছিলাম আমরা। এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমের নিজস্ব কায়দায় এর পরের অংশটা একটা বাড়তি গুরুত্বও পেয়ে যায়। রাজন উঠে এই কথা জানানোর পরে, আমরাও বাবুমশাইয়ের সঙ্গে একই ভাবে খেয়াল করতে থাকি মহাদেব কবিয়ালের জাতিগত আক্রমণের অন্যায্য কদর্যতার কথা, এর পরের ১ মিনিট ২০ সেকেন্ড জুড়ে কবিগানের যে আক্রমণটাকে প্রত্যক্ষ করি আমরা, ঠিক এর আগেই যে অংশটা আমরা উদ্ধৃত করলাম চলচ্চিত্র থেকে।

দাঁড়ান, 'কবি' নিয়ে আলোচনায় আর এগোনোর আগে, ব্যক্তিগত একটা প্রসঙ্গ ফয়সালা করে নেওয়া যাক, সেই ব্যাটা অনিন্দ্যর সঙ্গে, যার তৈরি করা বেদনা থেকে এই লেখাটাই আর লিখব না ঠিক করেছিলাম। এইমাত্র, ঠিক এর আগের প্যারাগ্রাফের আলোচনাটুকুতে আমরা এমন কিছু একটা করলাম যা পনেরো বছর আগে সত্য অর্থেই অসম্ভব ছিল। অনিন্দ্য ইত্যাদি সব অর্বাচীন ছেলেপুলেরা বারবার প্রমাণ করে চেষ্টা করে, এবারেও ফিল্ম ফেস্টিভালের টিকিট দিয়ে প্রলুব্ধ এবং বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিল। যুক্তি ছিল এই যে, কম্পিউটারে দেখে কী সেই অনুভূতিটা আদৌ আসে যা বড় পর্দায় আসে? আমি জানিনা সেই গুষ্টির

পিন্ডির অনুভূতিটা কী, কিন্তু এটুকু বুঝি যে সত্যকারের ফিল্ম দেখা এবং ফিল্ম পড়ার সূত্রপাত হয়েছে কম্পিউটার আসার পরেই। যেমন গতকালই আমি একটা ফিল্ম দেখলাম, জন জস্টের 'দি বেড ইউ স্লিপ ইন', ১৯৯৩-এর ছবি। জানিনা দেখার কিছুদিন পরে উত্তেজনাটা কতটা থাকবে, কতদিন থাকবে, কারণ একটা শিল্প সত্যিই কত বড় শিল্প (এই, আমি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি না আর্টের কথা বলছি) সেটা বোঝা যায় ওটা থেকেই। দেখার কত বছর পরেও সেটা মাথায় ফিরে ফিরে আসতেই থাকবে। সেই ব্যাপারটা তাই এখনই বলতে পারছি না, সদ্য গত কালই দেখেছি, কিন্তু দেখা মাত্র যে প্রাথমিক উত্তেজনাটা হয়েছে সেটা বোধহয় বার্গম্যানের 'অটাম সোনাটা' বা কুব্রিকের 'ব্যারি লিন্ডন' থেকে একটুও কম নয়। এই ফিল্মটা এবারের ফেস্টিভালেও দেখিয়েছে, এটা এবং দেবকী বসুর 'বিদ্যাপতি' এই দুটো দিয়ে আমায় লোভ দেখাচ্ছিল। এবং 'দি বেড ইউ স্লিপ ইন' চলচ্চিত্রটায় এত এত ফ্রেম ও দৃশ্য আছে যা এত বেশি অপ্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম রকমে উৎপন্ন, যে বহু জায়গায় থামিয়ে থামিয়ে, ফিরে দেখে দেখে ছাড়া ঠিক করে বোঝাই যায় না। এই আলোচনায় যেমন দেখুন, মহাদেব কবিয়ালে উঁচু জাতের মতাদর্শ ও শাসনকে 'কবি' চলচ্চিত্রে বাড়তি রকমে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করে দেওয়াটা খেয়ালই করা যেত না, যদি আমরা মিনিট দেড়েক পিছিয়ে না যেতাম। এই দেখা, চলচ্চিত্রের এই পড়া, পাঠ, অধ্যয়ন ব্যাপারটাই বোধহয় সম্ভব ছিল না কম্পিউটারে সিনেমা দেখার আগে। আমি একটা সফটওয়ারের ফিল্ম দেখছি, দেখতে দেখতে আর একটায় লিখছি, সেই করতে করতেই আর একটায় নেটে খুঁজে দেখছি, যেমন করে ওই মেসোপটেমিয়া যুদ্ধের ছবিটা পেলাম। একই স্ক্রিনে পাশাপাশি আমি 'কবি' চলচ্চিত্রটা দেখছি, আর কবি উপন্যাসের স্ক্যানটা পড়ছি (আমার কিন্তু আদৌ তা নয়, আমার 'কবি' একদম ঝুরো পাঁপড়ভাজা হয়ে গেছে, মানুকে কিনে দেওয়ার আর্জি জানাতেই ও বলল, এ মাসে আর বই কেনা যাবে না, আর কিনে কী হবে, এই লেখাটা শেষ হওয়ার পর কত বছর বাদে ফের লাগবে তার কোনও ঠিক আছে, তখনই কিনো), এইটাই শেষ অব্দি জ্ঞানের সেই উন্মুক্ততাকে খুলে দিল। ভাবুন তো কত বছর হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখে গেছিলেন ইন্টারনেটে এবং ওপনসোর্সে জানা ও খুঁজে দেখার এই উন্মুক্ততার কথা – জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী, বসুধারে রাখে নাই খণ্ডক্ষুদ্র করি। মোদ্দা কথাটা এই, আমার ইমেল আইডি আছে, যদি আপনি আমার পক্ষে হন, এবং অনিন্দ্যর বিপক্ষে, আমায় একটা মেল পাঠাবেন, আমি সেটা ওকে ফরওয়ার্ড করে দেব। আর যদি আমার বিপক্ষে হন, তাহলে আর অত পরিশ্রম করে মেল করে কী হবে?

চলচ্চিত্র 'কবি' যে জাতপাতের সংঘাতের জায়গাটাকে নাটকীয় এবং উচ্চারিততর করে তুলল শুধু সেটুকুতেই পরিবর্তমান সময়ের, এবং উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রের মধ্যে পেরিয়ে যাওয়া সময়টুকুর ছাপ আছে তাই নয়, আছে গোটা কবিগানের আসরের ফলাফলেও। সংঘাতের ফলাফল কী দাঁড়াচ্ছে তাতে 'কবি' উপন্যাসের বিবরণ ছিল একেবারেই পৃথক।

> লোকের কিন্তু তখন এ বিনীত মিষ্ট রস উপভোগ করিবার মত অবস্থা নয়। মহাদেব গালিগালাজের মত্তরসে আসরকে মাতাল করিয়া দিয়া গিয়াছে, এবং মহাদেবের তুলনায় নিতাই সত্যই নিষ্প্রভ। সুতরাং তাহার হার হইল। তাহাতে অবশ্য নিতাইয়ের কোনও গ্লানি ছিল না। বরং অকস্মাৎ সে নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিল।

উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে এই শেষ বদলটার একটা কারণ হতে পারে দৈর্ঘজনিতও। ঠিক এইরকম একটা বদল একটু বাদেই আমরা দেখব, নিতাই যেখানে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে সে আর কুলিগিরি করবে না। সেখানে চলচ্চিত্রের শরীরে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে বলেই আমার মনে হয়েছে। সেই কথায় আসছি একটু বাদে। তবে কবিগানের ফলাফলের নিরিখে উপরের বদলটা তারাশঙ্করের সঙ্গে দেবকী বসুর সমাজ বাস্তবতার বিচারের পার্থক্যের কারণেও হয়ে থাকতে পারে। তবে ফলাফলের ব্যাপারটা যাই হোক, জাতপাতের সংঘাতটা নাটকীয়তর হয়ে ওঠার মধ্যে অন্য একটা উপাদান আছেই, সেটা হল উপন্যাস আর চলচ্চিত্রের গঠনগত পার্থক্য। উপন্যাসের লেখক অনেকটা জায়গা পান, নিজের কথা বলে নেওয়ার। যেমনটা

বলেছিলেন তারাশঙ্কর, 'কবি' উপন্যাসের একদম শুরুর বাক্য থেকেই বারবার দেখেছি আমরা। চলচ্চিত্র ঘটে বাস্তব সময়ে, ঠিক যতটুকু বাস্তব ঘটনা সে দেখাচ্ছে, সেটুকুই তার সুযোগ এই বিষয়ে বিচারের। কিন্তু সেই জায়গাটুকু যে অত্যন্ত সঠিক ভাবে ব্যবহার করেছিলেন দেবকী বসু, তাই নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই। উপন্যাসে যা ছিল অনেক বিস্তৃত পরিসরে, অনেকটা উপ্ত অবস্থায়, তাকে একটা স্পষ্ট নাটকীয় উচ্চারিত আকার দিয়েছিলেন দেবকী বসু সফল ভাবে। উপন্যাসের প্রথম বাক্যের "রীতিমত এক সংঘটন" মন্তব্যের মধ্যে নিহিত অবস্থানকে কবিগানের আসরের নাটকে পুরোপুরি অনুবাদ করতে পেরেছিলেন চলচ্চিত্রকার।

193
00:18:57,450 --> 00:19:01,250
No. Going away from kabi(36)
Violates the Mother's temple.
194
00:19:01,450 --> 00:19:05,650
Violating the caste is nothing -
Remember it on your way home.

> না, শান্তিদা। কবি গাইতে এসে উঠে গেলে মায়ের স্থানের অপমান করা হবে।
> বটে? আর বাপদাদার বেইজ্জতটা কিছু না? আচ্ছা, গান ভাঙলে বাড়ি আসিস।

এইটা আর একটা ভারি আকর্ষণীয় জায়গা। যেহেতু চলচ্চিত্রকার দেবকী বসু আর উপন্যাসকার তারাশঙ্কর, তাই এই উপাদানটার অথর বা সৃষ্টিকর্তা ঠিক যেই হোন, উপাদানটি যে অত্যন্ত মোক্ষম তাতে কোনও সন্দেহই নেই। উঁচুজাতের নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিচুজাতের ব্যক্তি নিতাইয়ের যুদ্ধটা যে প্রথম থেকেই একটা দ্বিধায় আক্রান্ত সেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তাকে জয়ী হতে গেলে উঁচুজাতের ব্যাকরণে উঁচুজাতের মত করেই উঁচুজাতের যুদ্ধটা করতে হবে। সেই দ্বিধাটাই এখানে এসে একটা স্পষ্টতা পাচ্ছে অন্য একটা আকারে। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের ইংরাজ বিরোধিতা মূর্ত হয়ে উঠল শুধু সংবাদপত্র পড়ে পড়ে তার দক্ষ ইংরিজি লেখক হয়ে ওঠায়, বা মধুসূদনের ইংরেজ কবিদের চেয়েও বড় কবি হতে চাওয়া ইংরিজি ভাষাতেই লিখে – তারই যেন আর একটা চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। এই স্পষ্টতা টেনে আনে আর একটা মহাকাব্যিক তুলনাও। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গে, এক ব্রাহ্মণের অসময়ে অকালমৃত পুত্রের মৃত্যু কোন পাপে ঘটল তার ব্যাখ্যায় নারদ বললেন।

> সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে তপস্যা ক্রমাণ্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকেই আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শূদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই। এই নীচ বর্ণ ভবিষ্যতে ঘোরতর তপস্যা করিবে। কলিযুগই তাহার প্রকৃত সময়। শূদ্রজাতির দ্বাপরে তপস্যা করা অতিশয় অধর্ম। সেই শূদ্র আজ নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তোমার অধিকারে তপস্যা করিতেছে। সেই জন্য এই বিপ্রবালক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

রাজা রাম তখন এর নিরসনে গেলেন পঞ্চসপ্ততিতম সর্গে। কোথায় ঘটছে এই শূদ্রের তপস্যা তার তদন্তে গিয়ে রাম শেষ অব্দি খুঁজে পেলেন।

> দেখিলেন শৈবল পর্বতের উত্তর পার্শ্বে একটি সুপ্রশস্ত সরোবরের তীরে কোন এক তাপস বৃক্ষে লম্বমান হইয়া আছেন এবং তিনি অধোমুখে অতিকঠোর তপস্যা করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে রাম তাঁহার সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তাপস! তুমি ধন্য, বল, কোন্ যোনিতে জন্মিয়াছ।

ষটসপ্ততিতম সর্গে আমরা পাই কাহিনীর শেষটুকু।

> তাপস কহিল, রাজন্! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছি। এইরূপ কঠোর তপস্যা দ্বারা সশরীরে দেবত্বলাভ করা আমার ইচ্ছা। যখন আমার দেবত্বলাভের ইচ্ছা তখন নিশ্চয়

> জানিও মিথ্যা কহিতেছি না। আমি শূদ্রজাতি, আমার নাম শম্বুক। তাপস এইরূপ কহিবামাত্র রাম দিব্যদর্শন খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। শূদ্র শম্বুক নিহত হইলে সুরগণ বারংবার রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বায়ুসহযোগে সুগন্ধি পুষ্প চতুর্দিকে বর্ষিত হইতে লাগিল।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিবরণে একটা মজার জিনিস খেয়াল করুন। তাপসের ঝোলার বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে সম্মানবাচক ক্রিয়াপদ 'আছেন' এবং সর্বনাম 'তাঁহার', কিন্তু রাম যখন শম্বুকের মুন্ডু কাটছে তখন শম্বুককে উল্লেখ করা হয়েছে 'তাহার' এই সর্বনাম দিয়ে, 'তাঁহার' নয়। রামায়ণের সংস্কৃত তো চাইলেও দাঁত ফোটাতে পারব বলে মনে হয় না, নইলে দেখতাম, এর কতটুকু হেমচন্দ্রের আর কতটুকু বাল্মীকি উবাচ। ঠিক এই জাতীয় একটা অপরাধবোধ মোচন, তাপসের সম্মান থেকে তাকে জড়বস্তুর জড়তায় নিয়ে আসার একদম সমগোত্রীয়, পেয়েছিলাম চে গুয়েভারার 'রেমিনিসেন্সেস অফ দি কিউবান রেভলিউশনারি ওয়র' বইয়ে। বৌদ্ধবাচনের 'ওরা-আমরা' রূপকল্প ব্যবহার করে বলা যায়, যখনই 'ওরা' মারে, তখনই সেটা 'মার্ডার' বা 'কিল', আর যখনই মারছে 'আমরা', তখনই সেটা 'একজিকিউট' বা 'পানিশ'। যাকগে, মূল প্রসঙ্গে ফেরত আসা যাক। রামায়ণ এখানে নির্বাক, শম্বুকের স্বজাতীয়রা ঠিক কিভাবে নিয়েছিল এই নিধন, তাদের শ্রেণীসচেতনতার নিরিখে তারাও ওই সাধুবাদ আর সুগন্ধি পুষ্পে অংশ নিয়েছিল কিনা। আমাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে বহু উপাদান আছে যেখান থেকে শম্বুক ও তার স্বজাতীয়দের মধ্যেকার সম্পর্কের জটিলতাকে আমরা খুঁজতে পারি, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য এটাই যে, 'কবি' উপন্যাস বা চলচ্চিত্র দুয়েরই এটা একটা জোরের জায়গা যে এই উপাদানটা সেখানে বিস্মৃত হয় না। এবং, কবিগানের আসরে, যেখানে এটা ঘটছে, সেখানে যে জয়টা একটু বাদেই ঘটবে নিতাইয়ের, সেটা এখনও ঘটেনি। নিতাই সম্মান পেয়ে ফিরে আসার পরে তার স্বজাতীয়দের তার প্রতি কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার উল্লেখ উপন্যাসেও নেই।

213
00:21:14,000 --> 00:21:35,100
You smile, I weep,
And let the flute play
Below the 'Kadam' tree[37]

> তুমি হাসো, আমি কাঁদি,
> বাঁশি বাজুক কদমতলে রে।

গোটা ফিল্ম জুড়ে উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত রকমে যে অগণ্য সংখ্যক রাধা-কৃষ্ণ আলোচনার উল্লেখ ছড়িয়ে আছে তারই একটা এটা। প্রেম তার চূড়ান্ততার তুলনা পায় তখনই যখন সেই প্রেমে কদমতলায় বাঁশি বেজে ওঠে। মানে যেখানে প্রেমিক প্রেমিকা রাধা আর কৃষ্ণর যুগলরূপ পেয়ে ওঠে। যখন এর আগের লাইনগুলো গাওয়া হচ্ছে, সেই সময় থেকে একটানা পর্দায় নিতাই কাছে আসতে থাকে, এবং তার সঙ্গে তার বাঁদিকে আসরে বসে থাকা ঠাকুরঝি, খুব সচেতন ভাবেই ধরে রাখা ওখানের সবচেয়ে উজ্জ্বল মুখটি। এই লাইনদুটি যখন গাওয়া শেষ হয় তখন ফ্রেমে পড়ে থাকে সত্য অর্থে শুধু এই দুজনই। রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ আর আমরা চিহ্নিত করব না, কিন্তু গুণতে গুণতে যান, কতবার আসছে, এক সময় গোণা ছেড়ে দিতে হবে। এটাকে একটু আলোচনায় আনার হয়তো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য এলাকায় আমি একমাত্র পড়েছি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', তাই এই এলাকায় আমার খড়্গ নিষ্কোষিত করা নিতান্তই বেমানান। এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেম থেকে বৃহত্তর বাঙলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনূঢ়া কন্যার বিবাহ অব্দিও যে বিস্তৃত হয়ে গেছিল কদমের প্রেক্ষাপট, শুধু একটু হাতিঘোড়ার উপস্থিতিতে, তার প্রমাণ তো আছেই, "চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, কদমতলায় কে/ হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে, সোনামণির বে।"

221

00:23:42,100 --> 00:23:50,200
Who threw my books?
Ramayana, Mahabharat,
Manasamangal?[38]

> এ কী? কে ফেলে দিল? আমার রামায়ণ, আমার মহাভারত, মনসামঙ্গল? আমার ঘর থেকে এগুলো এখানে কে ফেলে দিল?

উপন্যাসে যা ছিল অনেক জায়গাতেই লেখকের বিবৃতিতে, বা স্থির বিবরণে, তাকে চলচ্চিত্রযোগ্য ঘটনায় পর্যবসিত করার এটা আর একটা উদাহরণ। কবিগানের আসরে এই বই এনে ফেলে দেওয়াটা চলচ্চিত্রের নিজস্ব সংযোজন। তবে নিতাইয়ের বইয়ের একটা তালিকা উপন্যাসেও আছে।

> যাহা ভাল লাগে তাহাই সে সযত্নে রাখিয়া দেয়। বইয়ের সংগ্রহ তাহার কম নয়– কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কৃষ্ণের শতনাম, শনির পাঁচালী, মনসার ভাসান, গঙ্গামাহাত্ম্য, স্থানীয় থিয়েটার ক্লাবের ফেলিয়া-দেওয়া কয়েকখানি ছেঁড়া নাটক; ইহা ছাড়া তাহার পাঠশালার বইগুলি–সে প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকখানি আছে।

ছোটবেলার বই সংগ্রহের তালিকা আমরা আগেই পেয়েছি, পাঠশালার লেখাপড়ার বিবরণের সূত্রে। সেখানে মনসার ভাসান ছিল না। তার মানে নিতাইয়ের 'যাহা ভাল লাগে' সূত্রে এটা যোগ হয়েছে। মনসার ভাসান সূত্রে আমার নিজের বেশ কিছু ছোটবেলার স্মৃতি আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমি বেজায় ভাল পড়তাম, সেই ছয় বা সাত বছর বয়সেই, পাঁচালিও, শনির এবং মনসার। মধ্যমগ্রাম বঙ্কিমপল্লীর বাড়িটা ছিল বেড়ার, খড়ের ছাউনি, পরে টিন লাগানো হয়েছিল। তখনও বরিশাল থেকে আসা উদ্বাস্তু পরিবারের উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন পর্চায় পাওয়া জমিতে সেই বাড়ির পুরো প্রেক্ষিতটাই ছিল গ্রামের, আজকের মধ্যমগ্রামের মাল্টিতলা বস্তিএলাকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যা আর মেলানোই যায় না। গোয়াল ছিল। গোয়ালের সামনে গোবর-নিকোনো উঠোনে, সন্ধে বেলায়, চান করে, কাচা ধুতি ভাঁজ করে পরা ছয় বা সাত বছরের আমি, লম্ফ ও প্রদীপের আলোয়, পাঁচালি পড়তাম। আর মনে আছে, গাল-তোবড়ানো ঠাকুমা খুব গর্বভরে অন্য গিন্নিদের দিকে তাকাতেন, বড় ছেলের বড় ছেলে এইটুকু বয়সেই কেমন পাঁচালি পড়ে দেখেছ? সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এটা লিখতে পেরে আমার মধ্যে একটা আরাম হল, ঠাকুমার কথা মনে করে। 'সে হাতে পূজিব আমি চ্যাংমুড়ি কানি?' বসে বসে পড়ছি আমি খালি গায়ে দুলে দুলে, আমার মনে আছে।

যাই হোক, সেই পাঁচালি সূত্রে আমি যতদূর জানি, মনসার ভাসান হল মনসামঙ্গলেরই আর একটু প্রাকৃত, আরও একটু সৃষ্টিশীল এবং প্রক্ষিপ্ত কিছু যোগ হওয়া নানা সংস্করণ। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু মনসার ভাসান বা মনসামঙ্গল যাই হোক, তার কিন্তু একটা গুরুত্ব আছে এখানে নিতাইয়ের পড়ার উপাদান হিসাবে উল্লিখিত হওয়ার। আমার এই বিষয়ে সেই যোগ্যতাটাই নেই আর অগ্রসর হওয়ার, কিন্তু খুব স্পষ্ট একটা সংযোগ আছে মনসার সঙ্গে অনার্য ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক আচরণের ডিসকোর্সের। বৌদ্ধ একটা সংযোগও বোধহয় আছে। অন্তত অনার্য সংসর্গটা তো প্রশ্নাতীত। আমি সাবটাইটলেও তাই উপাদানটা উল্লেখ করে রেখেছিলাম। রামায়ণ এবং মহাভারত – আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যদি প্রতিনিধিত্ব করে, নিতাইয়ের জীবন আচরণ সংস্কৃতির আলোচনায় অনার্য উপাদানটাও যে আছে, তার একটা জ্যান্ত ইতিহাস সহ, সেটা এখানে চিহ্নিত থাকছে। ঠিক শনির পাঁচালিতেও যেটা সত্যি, চলচ্চিত্রে যা আর উল্লিখিত হয়নি। অর্থাৎ, শম্বুকেরও একটা বংশধারা আছে, সেই বংশধারা অনুযায়ী উপাদান জমে জমে তারও একটা ইতিহাস তৈরি হয়ে আছে। নিতাই সেটাও পায়, শুধু রামায়ণ মহাভারতই পায় না।

239
00:26:10,450 --> 00:26:18,300
Old Balia says it good:

Train maybe late, the girl never.

> আমাদের বুড়ো বালিয়া বলে মন্দ নয়। টিরেন লেট হোতি, লেকিন ছোকরি না লেট হোতি।

এর পরে ভাষাগত বর্গসঙ্করতার প্রশ্নে আমরা আবার আসব। এখানে লক্ষ্য করার জায়গা এটাই যে পরিবারের নারীরও একটা অভ্যস্ততা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে হিন্দির সঙ্গে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এটা আমরা বেশ কয়েকবার দেখতে পাব চলচ্চিত্র জুড়ে।

247
00:26:40,700 --> 00:26:50,200
That I can't bear - Maharani!
Living by rail-track,
here and there! Maharani!
248
00:26:50,600 --> 00:26:54,800
Say mathrani, chnachrani!![42]

> অয়, অয় কথা আমি সইতে লারি। মহারাণী! না ঘর, না দুয়ার, অ্যালের ধারে বাস!
> আজ চণ্ডীতলা, কাল পিণ্ডিতলা। মহারাণী! মেথরানি! ছ্যাঁচরানি!

ঠিক এর আগের আলোচনাতেই যে ভাষাগত বদলের উল্লেখ করলাম তার সঙ্গেই একটা সংযোজন হিসাবে আসছে এটা। গ্রামীন সমাজের কাঠামোর পুরনো স্থিতিটা এর মধ্যেই ভেঙেচুরে গেছে রেলতন্ত্রের হাতে। বদলির চাকরির সূত্রে নানা জায়গায় আবাস রচনা এই বদলাতে থাকা সময়েরই আর একটা চিহ্ন। আর একটা মজার উল্লেখও করে রাখি। এই ম্যাথরানি এসেছে মেথর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে। যে নারী নোংরা পরিস্কার করে, বা যে নর নোংরা পরিস্কার করে তার স্ত্রী, এই অর্থে। যতদূর সম্ভব দ্বিতীয়টা। যে মেথর-এর স্ত্রী এই মেথরানি সেই 'মেথর' শব্দটা এসেছে বৌদ্ধ ধর্মকাঠামোয় একটা উঁচু পদের নাম 'মহাথের' থেকে। এটা আমি পড়েছিলাম কোথাও একটা, বোধহয় দীনেশ সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' বইয়ে। কিন্তু ওটা এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই। তাই মেলাতে পারছি না। বৌদ্ধধর্মকে সমাজ জীবন থেকে মুছে দেওয়ার যে বিরাট কর্মকাণ্ড ঘটেছিল ব্রাহ্মণ্যের হাতে, রক্তপাত সহ, সেই কর্মকাণ্ডেরই একটা খুচরো সাংস্কৃতিক উপাদান এটা। যাই হোক, এটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু উল্লেখ করতে মজা লাগল।

261
00:27:41,900 --> 00:27:48,800
Fill stomach by the porter's job.
At night, fill heart with songs.
262
00:27:48,900 --> 00:27:51,800
No Rajan, no porter job any more.
263
00:27:51,900 --> 00:27:53,000
What?
264
00:27:53,300 --> 00:27:58,700
Come, let me read Ramayana,
And you smoke the cigarette.
265
00:27:58,900 --> 00:28:01,700
Then tell me whatever you want.

266
00:28:01,900 --> 00:28:03,500
Come, Rajan.

> তুম উস্তাদ, দিনমে কুলিগিরি করকে পেট ভরাও, আওর রাতমে গানা গাকে দিল ভরাও, হাঁ? চলো, চলো।না রাজন। কুলিগিরি আর আমি করব না।
> কেয়া?
> তুমি ঘরে এসো রাজন। আমি তোমায় রামায়ণের একটা পদ পড়ে শোনাই। তুমি ততক্ষণ সিগারেট খাও।
> তারপর তোমার প্রাণ যা চায় তাই আমাকে শুনিও।
> এসো রাজন।

প্রথমে চলচ্চিত্রে প্রসঙ্গটা কিভাবে এল সেটা দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে রাজনের মন্তব্যে ইঙ্গিত আছে সেই অতিনির্ণয়ের, আগেই যেটা আমরা দেখেছি, আধুনিকতার পেশা থেকে জীবিকা অর্জন আর ঐতিহ্যের সক্রিয়তা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেটা নয়, কৌতূহলটা অন্য জায়গায়। এই একমাত্র জায়গা 'কবি' চলচ্চিত্রের যেখানে খুব স্পষ্ট একটা নির্মাণের গরমিল পেয়েছি আমি, এবং যা একটুও ছিল না 'কবি' উপন্যাসে। এতটাই বেমানান লেগেছে এটা অবশিষ্ট চলচ্চিত্রটা তৈরির সুচারু সুপরিকল্পিত রকমের সঙ্গে যে, 'কবি' চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত একজনও কেউ যদি আজও বেঁচে থাকেন, এবং তার স্মৃতিতে থেকে থাকে এই খুঁটিনাটি তো সেটা আমি জানতে আগ্রহী। গরমিলটা কোথায় সেটা আগে দেখে নেওয়া যাক উপন্যাস থেকে।

> নিতাই গম্ভীরভাবে বিষণ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিল–কুলিগিরি আর করব না রাজন।
> রাজা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। ... রাজা আসিয়া বসিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিল–
> কেয়া হুয়া ভাই তুমারা? কাম কেঁও নেহি করেগা? ...
> নিতাই হাসিয়া বলিল–শোন, আগে এই কাহিনীটা শোন।
> রাজা বলিল–দূ-রো, ওহি লিখাপড়ি তুমারা মাথা বিগড় দিয়া।
> নিতাই তখন পড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। রাজা অগত্যা একটি বিড়ি ধরাইয়া শুনিতে বসিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তন্ময় হইয়া গেল।
> "বর দিয়া ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
> আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।।"
> পড়া শেষ করিয়া নিতাই রাজার মুখের দিকে চাহিল। রাজা তখন গলিয়া গিয়াছে। সে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল–সীয়ারাম! সীয়ারাম!
> তারপর নিতাইয়ের তারিফ আরম্ভ হইল–আচ্ছা পড়তা হ্যায় তুম ওস্তাদ! বহুৎ আচ্ছা!
> নিতাই এবার গম্ভীরভাবে বলিল–রাজন, এইবার তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ।
> রাজা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল–কি?
> জানালা দিয়া রেললাইনের রেখা ধরিয়া দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল–
> রত্নাকর, ধর কবি হলেন, তারপর কি তোমার তিনি ডাকাতি করতেন, না, মানুষ মারতেন? ... তবে? আর কি আমার মস্তকে করে মোট বহন করা উচিত হবে? বাল্মীকি মনির কথা ছেড়ে দাও! কার সঙ্গে কার তুলনা! ভগবানের অংশ, দেবতা ওঁরা। কিন্তু আমিও তো কবি। না হয় ছোট।

এবার দেখে নেওয়া যাক, এই গোটা প্রসঙ্গটা, যার শুরুটা আমরা আগেই দিলাম, কিভাবে সম্পূর্ণ হচ্ছে চলচ্চিত্রে, এর পরের দৃশ্যেই। ঠিক এর পরের দৃশ্যে নয়, মধ্যে একটা সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন দৃশ্যও চলে যাচ্ছে। চলচ্চিত্রের এই দৃশ্যটা মনে রাখুন, "কেয়া?" বলে রাজা বিস্ময় প্রকাশ করার পরেই নিতাই নিয়ে এল রামায়ণ পড়ার কথা, এমন একটা রকমে, যাতে মনে হতেই পারে, রামায়ণ থেকে কিছু একটা শোনাতে যাচ্ছে নিতাই, যা শুনে নিতাইয়ের কুলিগিরি না-করার সিদ্ধান্তের কারণটা যেন বুঝে যাবে রাজা,

শোনার পরে রাজার যে আর কিছু বলার থাকবে না, এটা যেন আগে থেকেই জানে নিতাই।আর উপন্যাসটা পড়া ছিল অনেকদিন আগে, এত মনেও ছিল না। তাই ফিল্মটা দেখতে গিয়ে, এর পরের দৃশ্যতেই গরমিলটা চোখে পড়েছিল। চলচ্চিত্রে এর পরের সংলাপটা ফের রাজা আর নিতাইয়ের মধ্যেই।

267
00:28:07,900 --> 00:28:12,500
No.
No more petty jobs for you.[44]

নাঃ।
আর তোমার ছোট কাম করা চলবে না ওস্তাদ। কভি নেহি।

রাজার এই সংলাপটা শুরু হচ্ছে ৭.৯ সেকেন্ড থেকে। আর এর আগের নিতাইয়ের সংলাপটা শেষ হয়েছে ৩.৫ সেকেন্ডে। সাড়ে তিন থেকে সাড়ে সাত সেকেন্ড ছিল একটি খুচরো দৃশ্য – রেললাইন ধরে হেঁটে হেঁটে আসছে ঠাকুরঝি। রাজার এই সংলাপের পরেই দেখব সেই কৃষ্ণচূড়ার তলায় নিতাইয়ের বাঁধা গান গাইছে ঠাকুরঝি, নিতাইয়ের অপেক্ষায়। তার মানে, তখন, মাঝের ওই জায়গাটায়, ওই দিকেই হেঁটে আসছিল ঠাকুরঝি। ফিল্মটা দেখাকালীন, আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম, আরও ততদিনে উপন্যাসের মূল প্রসঙ্গটা একদমই ভুলে গেছি। ভাবলাম, এটা কী হল? মধ্যে কী ঘটল, যাতে কুলিগিরি না করার সিদ্ধান্তের প্রতি বিস্মিত বৈপরীত্য থেকে সক্রিয় সমর্থনে পৌঁছে গেল রাজা? রামায়ণ পড়ার আর সিগারেট খাওয়ার প্রস্তাব দিল নিতাই, তার পরেই এটা ঘটল কী করে? ফিল্ম দেখার পরে ফের উপন্যাসটা পড়তে গিয়েই এখানে রামায়ণের ভূমিকাটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু সমস্যাটা এই যে, যদি 'কবি' চলচ্চিত্রের এটা ইচ্ছিত আকারই হয়, তাহলে এটা অত্যন্ত খাজা হয়েছে, চলচ্চিত্রের অবশিষ্ট পরিকল্পিত সুচারু আকারের সঙ্গে এই গোটাটা অত্যন্ত বেমানান। ওখানে রেল আইন ধরে ঠাকুরঝি আসার বিশেষ কোনও তাৎপর্যই নেই। এরকম অর্থহীন দৃশ্য গোটা ফিল্মে আমি আর একটিও মনে করতে পারছি না।

জানিনা, আমার এরকম ভাবতে ইচ্ছে করছে বলেই ভাবছি কিনা, কিন্তু আমার নিজের মনে হয়, এখানে অন্য কোনও একটা পরিকল্পনা ছিল দেবকী বসুর। রামায়ণ পাঠের একটা কোনও দৃশ্য বোধহয় তোলার পরিকল্পনা ছিল তার। ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না, আর এই মুহূর্তে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ঘেঁটে দেখার উদ্যমটাও নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। আরও আজ আমার এক বন্ধুর বড় মেয়ে আত্মহত্যা করেছে, সেই সংবাদটা সকালে পাওয়ার পর থেকেই সবকিছু কেমন গরমিল হয়ে গেছে। সারাদিন পারিনি, সন্ধ্যার পর এই অংশটা জোর করে লিখতে বসলাম, যদি একটুও মন তুলে নিতে পারি, এই আশায়। তাই নিশ্চিত বলতে পারি না, কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে প্রায় এরকমই আকারের পংক্তি কৃত্তিবাসে আছে। আমার যেন মনে হয়, তারাশঙ্কর বা দেবকী বসু ভেবে রেখেছিলেন ওই পংক্তিটা পাঠের দৃশ্য ওখানে গুঁজবেন, পরে আর হয়তো হয়ে ওঠেনি, নানা কারণে। নইলে রামায়ণের প্রসঙ্গ আনা, ওখানে দৃশ্য কেটে দৃশ্যান্তরে যাওয়া, আবার কেটে ওই দৃশ্যে ফেরত আসা, এর গোটাটাই বড্ড বাজে, এলোমেলো, সচেতন পরিকল্পনার অভাবের চিহ্ন, যা কিছুতেই গোটা ফিল্মের সঙ্গে যায় না। এবং যদি তা হত, তাহলে, দ্বিতীয় দফায়, যখন রাজা তার সমর্থন জানাচ্ছে কুলিগিরি না করার সিদ্ধান্তে, সেখানে আরামসে গুঁজে দেওয়া যেত, 'রত্নাকর কেয়া বাল্মীকি বননে কা বাদ কভি খুন করতা' ইত্যাদি খারাপ হিন্দির কোনও সংলাপ। সেটাই বা করলেন না কেন, তাহলে তো অর্থহীনতা আর থাকত না, দর্শকও ধরতাইটা পেয়ে যেত, রামায়ণ কেন এল সেই প্রশ্নটাই আর থাকত না। গতকালই একজন বলল, রবীন মজুমদার এখনও বেঁচে আছেন, তাঁর কাছে জানা যেতে পারত কিনা জানিনা, এই জায়গাটায় কোনও নির্মাণগত কোনও গন্ডগোল ঘটেছিল কিনা।

273
00:29:07,200 --> 00:29:10,600
Calm down, thakurjhi.

Had my new quarters today.
274
00:29:10,750 --> 00:29:12,600
So I had a lot of things to do.
275
00:29:12,750 --> 00:29:15,700
Burner, utensil, pots for tea -
Arranged everything.
276
00:29:16,750 --> 00:29:20,300
You'll make tea, have it.
Today not in Rajan's place.

> রাগ কোরো না ঠাকুরঝি। আজ আমার লতুন ঘর পাতানো হল।
> তাই গোছাতে দেরি হয়ে গেল।
> চায়ের উলুন, হাঁড়িতে জল – সব ঠিক করে এলাম।
> তুমি চা করবে, চা খাবে। আজ রাজনের বাড়িতে নয়।

এই গোটা কথনটা লক্ষ্য করুন। চালু ও আবহমান পুরুষ অবস্থানের থেকে বেশ পৃথক একটা অবস্থান এটা। একটা অভ্যস্ত পারিবারিক ভূমিতে এটা ঘটা বেশ অসম্ভাব্য। একটি পুরুষ একটি নারীর জন্য ঘর-গেরস্থালি, বাসনকোসন সব গুছিয়ে রাখছে, একটি নারীর ভোগের জন্য, এটা বেশ পৃথক। এবং একটু বাদেই আমরা দেখতে পাব, অভ্যস্ত পারিবারিক ভূমিতে একটি নারী কোনও কিছু ভোগ করছে এটা কত বড় একটা অনভ্যস্ততা, এবং তাকে কী ভাবে স্বাভাবিক দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যাওয়াটাই শিষ্টতা, এটা 'কবি' চলচ্চিত্রে খুব স্পষ্টতা নিয়ে চিহ্নিত আছে একটি দৃশ্যে, সেটায় আমরা আসছি একটু বাদেই। কিন্তু খেয়াল করার এটাই যে, নারী গুছিয়ে রাখছে, নিমিত্তটা হল পুরুষের ভোগ – এই পারিবারিক অভ্যস্ততার গতিমুখটা এখানে উল্টে যাচ্ছে। শুধু এই একবারই নয়, 'কবি' চলচ্চিত্র জুড়ে পুরুষ-নারী সম্পর্কের মানচিত্রে ঘটে উঠবে আরও অনেকগুলি বদল। এবং এই প্রথমটির চেয়ে আরও অনেক বেশি নাটকীয় এবং জটিল তাদের অনেকগুলিই। সেগুলোয় আমরা এক এক করে আসব। আরও দেখার এই যে, এই ঘটনাটার ভিত্তি একটা রেল কোয়ার্টার। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক পুঁজির অভ্যন্তরে এই ক্রমজন্মমান আধুনিকতা, এক্ষেত্রে রেলকে ঘিরে, ঘটে উঠতে শুরু করেছে। নিতাইয়ের নিজের পারিবারিক ভূমির সাপেক্ষে এই গোটাটাই হত একটা অসম্ভাব্যতা। এই ঘটনাটা, বা, তার সূত্রে ব্যক্তি নারী ও ব্যক্তি পুরুষের এই ব্যক্তি সম্পর্কটা। এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্নপূর্ণা নারীর অবস্থান থেকে সরে গিয়ে নারী ভোক্তা হয়ে উঠছে, এবং ঘর-গেরস্থালির কাজ বেয়ে তাকে যত্ন করার, তার মনোরঞ্জন করার, চেষ্টা করছে একটি পুরুষ।

হ্যারিয়েট ফ্রাড, স্টিফেন রেজনিক এবং রিচার্ড উলফের একটা বই ছিল, 'ব্রিংইং ইট অল ব্যাক হোম' নামে। তাতে ফ্রাডের লেখা একটি অধ্যায় ছিল অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা এবং সেই সূত্রে নারীশরীরে আধারে ঘটতে থাকা রাজনীতি নিয়ে। বছর পনেরো আগে, রাক্ষস পত্রিকায় এই অধ্যায়টির একটা অনুবাদও করেছিলাম, আর একজন সহ-অনুবাদকের সঙ্গে। ফ্রাড নিজে একজন মনোবিশ্লেষক, তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, কী ভাবে নারীশরীরের মধ্যে ঘটে চলতে থাকে অন্নপূর্ণা-রাজনীতি। সে জানে তাকে খাবার দিতে হয়, অন্যদের, হয় প্লেটে, নয় বুক থেকে, এটা তার কর্তব্য। এই কর্তব্যের নিরিখে সে নিজেকে সাজিয়ে নেয় এক ভাবে, নিজেকে অন্নপূর্ণা করে। আবার সে আসে বাজারের মুখোমুখি। সেখানে সে ছাত্র বা শ্রমিক বা যাই হোক, সেই ভূমিতে সে সেই একই ইঁদুরদৌড়ের অংশ যেখানে তাকে অন্যের মুখ থেকে ছিনিয়ে খেতে হয়, বাজারের বেদান্তে যার অন্য নাম প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক। এই দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত গতিমুখকে একই সঙ্গে একই নারীশরীরে ধারণ করতে গিয়ে তার শরীরের রাজনীতির ঐক্যটা ভেঙে যায়, বিস্ফোরিত হয়ে যায়, সেখান থেকে কী ভাবে আসে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বা অ্যানোরেক্সিয়া

বুলিমিয়া সেই আলোচনায় গেছিলেন ফ্রাড। খেয়াল করুন, ঠিক সেই গতিমুখটা নিয়েই আলোচনা করছেন ফ্রাড, যেটার উল্টে যাওয়াটা আমরা চিহ্নিত করছি চলচ্চিত্রের এই অংশে। এবং নারীপুরুষের সম্পর্কের এই নতুন চরিত্রের গতিটার ইঙ্গিত ছিল উপন্যাসেও। সেখানেও সেটা ঘটতে পেরেছিল সেই রেল-কোয়ার্টারের আশ্রয়েই। নিজে বানিয়ে চা খাচ্ছিল নিতাই, দুধ দিতে আসা ঠাকুরঝিকে নিতাই বলেছিল:

> –এস, এস, একটুকুন চা আছে–খাবে এস।
> –না না। ঠাকুরঝির চা খাইতে বেশ ভালই লাগে, কিন্তু মেয়েদের ভাল লাগার কথা নাকি বলিতে নাই। ছি!

আমি জানি না, আজ এতদিন পরেও, বাংলা লেখায় বা চলচ্চিত্রে, নারীর ভোগের প্রতি পুরুষের যত্নের কতটুকু উদাহরণ আমরা পাই। বা, কতটুকু পাই বাংলা জীবনেও। এবং এই যে ঠাকুরঝির চিন্তার বকলমে তারাশঙ্করের মন্তব্য, "মেয়েদের ভাল লাগার কথা নাকি বলিতে নাই", এর একটা ভারি দক্ষ চলচ্চিত্রায়ন করেছিলেন দেবকী বসু, যেখানে লেখক কেন, চরিত্রটিরও কোনও মন্তব্য প্রয়োজন পড়েনি। সম্পূর্ণ নির্বাক সেই দৃশ্যটির কথায় আসছি একটু পরেই।

278
00:29:24,850 --> 00:29:30,500
I'm not in caste profession,
Engage in kabi - they dislike.
279
00:29:30,850 --> 00:29:32,900
Gentlemen are angry too.[45]

> আমি জাতব্যবসা ছেড়ে গান বাঁধি, কবিগান গাই। তাই ওরা আমার উপর রাগ করেছে। ভদ্দরলোকেরাও রেগে গেছে আমার উপর।

নিজের ডোম জাতের ভিতরকার বিরূপতার কথা বলা মাত্রই নিতাই বলে ওঠে ভদ্দরলোকদের মানে উঁচু জাতের বিরূপতার কথাও। তার এই দ্বিমুখী দ্বিধার কথা আমরা আগেও একাধিকবার উল্লেখ করেছি, সে আর শূদ্রও নেই, এবং উঁচুজাতও সে হয়ে ওঠেনি, এই নিরালম্ব বায়ুভূত অবস্থানটা চিহ্নিত করে একটা মাধ্যমিক অবস্থিতির কথা। যখন সে কোনও বর্গেই আর পড়ছে না। এবং নতুন অর্থ নতুন দৃষ্টি নতুন সংস্কৃতি জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্রে এই বর্গসঙ্করতার তাৎপর্যের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

291
00:30:06,650 --> 00:30:10,300
Rascal, son-of-a-doam, you're
Lucky enough to be allowed in kabi.
292
00:30:10,550 --> 00:30:18,800
And money too? Mother Goddess
Will now issue you handnote?

> ওরে ব্যাটা, ডোমের ছেলে হয়ে মায়ের এখানে গান করতে পেরেছিস, সেই তোর ভাগ্যি।
> তার উপরে আবার টাকা? বলিহারি ময়না, বুলি শিখেছিস ভাল। এবার মা চামুণ্ডাকে তোর টাকার জন্যে হ্যান্ডনোট লিখতে হবে, না?

সাংস্কৃতিক স্তরে স্বীকৃতিটা এসেছে, এখনও বাস্তব অর্থে, অর্থকরী জায়গায়, টাকা ও পয়সার অঙ্কে বদলটা চিহ্নিত হতে কিঞ্চিত দেরি আছে। সংস্কৃতিতে বদলটা ঘটেছে, অর্থনীতিতে আসতে আরও একটু দেরি আছে।

301
00:30:44,900 --> 00:30:50,400
Mahadev was right -
Son of wise doam
Started getting stupid

মহাদেবদা তো ঠিকই বলিছিল, _সুবুদ্ধি ডোমের পো, কুবুদ্ধি ঘটিল_।

খেয়াল করুন, মহাদেব কবিয়ালের মূল পংক্তি একটু বদলে গেছে এই উদ্ধৃতিতে, এবং সেটাই স্বাভাবিক। গানের পংক্তি যখন মুখে মুখে ফেরে তখন এই ভাবেই সেটা বক্তার নিজের পংক্তি হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা আমার নিজের গদ্যের সাপেক্ষেও বেশ জরুরি একটা কথা। আমার গদ্যে শুধু বহু বাক্য নয়, এমনকি ধরতাই অব্দি অনেক জায়গায় তৈরি করেছি 'সাতটি তারার তিমির' ঝাড়েবংশে লোপাট করে করে। লোকে বুঝতে চায়না গদ্যের নিচে নিচে সেই পংক্তিগুলো আসলে জীবনানন্দের না, আমারই লেখা। যাকগে, ও কথা ছেড়ে দিন। জায়গাটা দেখুন, এই 'ভদ্দরলোক' শ্রেণীর কুলি খুঁজতে থাকা মানুষটি ইতিমধ্যেই একজন জ্যান্ত সম্পাদকও হয়ে উঠছেন। তিনি চয়ন করছেন সমগ্র কবিয়াল অনুষ্ঠান থেকে নির্বাচিত কিছু পংক্তি, এবং সেগুলো নিজের বাচনের মত করে বদলে নিয়ে তিনি প্রয়োগ করছেন।

তার চয়ন, সঙ্কলন, এবং সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়ে চলেছে সেই সাংস্কৃতিক বা আলথুসেরের ভাষায়, দি কালচারাল – অর্থ নির্মাণ, নিষ্কাশন, ও আত্মীকরণের প্রক্রিয়া। যেমন তিনটি কমপ্লেক্স বা জটিল-প্রক্রিয়ার অতিনির্ণয়ে সমাজবাস্তবতাকে বুঝেছিলেন আলথুসের। দি ইকনমিক, বা অর্থনৈতিক, মানে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হওয়ার, নিষ্কাশন করার এবং আত্মীকরণের প্রক্রিয়া। দি পলিটিকাল, বা রাজনৈতিক, মানে ক্ষমতা তৈরি হওয়ার, নিষ্কাশন করার, এবং আত্মীকরণের প্রক্রিয়া। আর দি কালচারাল, বা সাংস্কৃতিক, যার কথা আমরা আগেই বললাম। অতিনির্ণয় বা বহুমুখী কারণসম্পর্কের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দাঁড়ান, একটু দু-চারটে কথা এখানে বলে নিই, যারা এমনি, বিনা কাজে পড়ছেন লেখাটা তারা আবার পরের প্রসঙ্গ থেকে শুরু করতে পারেন, এটুকে বাদ দিয়ে। আসলে এটা বলতেই হচ্ছে। এই লেখাটা লিখতে লিখতে অনেককেই ইমেলে পাঠাচ্ছি। সেঁজুতি ইত্যাদি দু-তিনজন ওরকম, ইমেল থেকে পড়ে, এই বিষয়ে কিছু কথা বলছিল, জিগেশ করছিল। আর এরা সব অসম্ভব আলসে, আগেই দুটো প্রবন্ধের উল্লেখ করেছি, সেগুলো ঝপাঝপ একবার পড়ে নিলেই মিটে যায়, তা না করে, নানা কথা জিগেশ করছিল। তাই মনে হল, এখানে একটু দু-চারটে কথা বলে নিলে ওদের বোঝার সুবিধে হয়।

এই যে আলথুসেরের অতিনির্ণয় বলছি, কেন, এটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিশদ আলোচনা ওই প্রবন্ধগুলোয় আছে। তাতে না গিয়েই বলা যায়, চিরাচরিত মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতির চিন্তার গতিমুখকে বদলে দেওয়া হয় এই অতিনির্ণয়ে। যেমন, মার্ক্সবাদী কাঠামোয় থাকে বেস ও সুপারস্ট্রাকচার, ভিত্তি ও উপরিকাঠামো। অর্থনীতি হল ভিত্তি, আর সংস্কৃতি হল উপরিকাঠামো। মানে সহজ কথায়, লেজ। কুত্তা যেখানে যাবে, লেজও সেখানেই যাবে। লক্ষণীয় এই যে, আমি কুত্তা বলেছি, বিল্লি বলিনি। বিল্লি হলেই সে ব্যাটা বা বেটি মাঝেসাঝে চেশায়ার থেকে আসতে পারে, আর চেশায়ার বিল্লির ওইসব অতিলৌকিক ক্ষমতার কথা তো ইতিহাসেই আছে, সে ব্যাটা মিলিয়ে গেল, তার হাসিটা রয়ে গেল। এবার আলথুসেরের তত্ত্বে, কুত্তা থেকে লেজে এই একমুখী নির্ণয় আর রইল না। লেজও কুত্তাকে নির্ণয় করতে পারে, এই সম্ভাবনাটা দর্শনগত ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হল। মার্ক্সবাদী তত্ত্বের ওই একমুখী নির্ণয়কে নিয়ে, তার কেলেঙ্কারিগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা আছে ওই প্রবন্ধদুটোয়, দুটোই নেটে তোলা আছে, আগেই বলেছি। কিন্তু, আপনারা আমার সত একনিষ্ঠতাটা কি লক্ষ্য করেছেন, বা মনে মনে সেটার প্রশংসা করেছেন? আমি কিন্তু প্রতিশ্রুতি বজায় রেখেছি, গরুকে ঠিক শ্মশানে এনে ফেলেছি। এই শেষ আলোচনায় অর্থের রাজনীতির যে চয়ন সঙ্কলন সম্পাদনের কথা উল্লেখ করলাম, সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে এর ঠিক পরের বিপ্রপদ ঠাকুরের সংলাপে।

303
00:30:55,050 --> 00:31:01,300
Nitai, what Mahadevda said?
Left-over in garbage,
Dreaming to reach heaven.
304
00:31:01,800 --> 00:31:12,200
Ohh - and you replied?
Abracadabra doodle-dup
Mahadev shut up.

> হ্যাঁ রে নিতাই, মহাদেবদা তোকে কী বলছিল রে? _আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতা, সগ্গে যাবার আশা গো_ ওঃ হো।
> আর তুই তার উত্তরে কী বললি? _উড়ুপ উড়ুপ উঁপ, খ্যাকোর খ্যাকোর উঁপ, চুপ রে বেটা মহাদেবা, চুপ চুপ চুপ_ আঃ হাঃ হাঃ।

একটু আগে আমরা সাংস্কৃতিক বা আলথুসের কথিত দি কালচারালের কথা উল্লেখ করেছিলাম, গোটা সমাজ জুড়ে সাংস্কৃতিক ক্রিয়া বা রচনার অর্থ তৈরি হওয়া, সেই অর্থকে বার করে আনা, এবং সেই অর্থকে নিজের কাজে নিজের মত ব্যবহার করার জটিল ও বহুমুখী পদ্ধতিটাকে আলথুসের নাম দিয়েছিলেন দি কালচারাল। আর ক্ষমতা তৈরি হওয়া, বার করে আনা, এবং সেটা ব্যবহার করার নাম দিয়েছিলেন দি পলিটিকাল বা রাজনৈতিক। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকের নিবিড় পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও অতিনির্মাণের এর চেয়ে ভাল উদাহরণ যে কোনও ভাষার সাহিত্য বা চলচ্চিত্রেই বিরল। 'মিথস্ক্রিয়া' শব্দটি কারুর কারুর কাছে অপরিচিত লাগতে পারে, তাই জানাই, 'মিথঃ' বা 'মিথস্' শব্দের অর্থ ঋগ্বেদ, রামায়ণ বা অভিজ্ঞানশকুন্তল অনুযায়ী অনুযায়ী হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় করেছেন '১। সহ, অন্যোন্য, পরস্পর; ২। রহঃ, একান্তে, নিভৃতে'। ওভারডিটারমিনেশন বা অতিনির্ণয় এই প্রক্রিয়ার সমার্থক শব্দ হিসাবে এই শব্দটা বেশ যায়, যদি আমরা প্রথম অর্থটা নিই, 'পারস্পরিক ক্রিয়া' এই অর্থে। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র, রাজশেখর, রামেন্দ্রসুন্দর ইত্যাদি দুচারজনের আর কেউ যে তত্ত্বচর্চায় তেমন লিপ্ত হননি তার ফল ভোগ করতে হয় আমাদেরই, দর্শন-বিজ্ঞান-তত্ত্ব চর্চার সঠিক গদ্যই তেমন তৈরি হয়ে উঠতে পারেনি। এখানেও সেই একই সমস্যা, বাংলা ভাষায় লেখালেখি পড়ে কারা, ঘরের বৌয়েরা আর চাকরবাকরেরা। হুবহু মনে নেই কিন্তু প্রায় এরকমই একটা মন্তব্য ছিল বঙ্কিমের লেখায়। যে কোনও লেখায়, প্রবন্ধ হোক বা গল্প বা উপন্যাস, একটু বিশেষ অর্থে কিছু বলতে গেলেই শব্দ অকুলান হয়ে পড়ে।

যা বলছিলাম, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক এই দুই প্রক্রিয়ার ভিতরকার সম্পর্ক। বিপ্রপদ ঠাকুরের ওই মন্তব্যটা লক্ষ্য করুন। মহাদেব কবিয়ালের পংক্তিটাও হুবহু একই নেই, কিঞ্চিত বদলেছে। কিন্তু যেমন বললাম, আগের ওই কুলি-সন্ধানী ভদ্রলোকের বেলাতেও যা সত্যি, মহাদেব কবিয়ালের পংক্তি থেকে নড়ে যাওয়াটা, দুটি ক্ষেত্রেই একটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নড়ে যাওয়াকে দেখাচ্ছে, যে স্থানান্তর মহাদেবের পংক্তির মূল ইচ্ছিত ঘাতকে কোনও মৌলিক বদল দিচ্ছে না। ওই ভদ্রলোক আর বিপ্রপদ ঠাকুর দুজনেই মহাদেবের ইচ্ছিত অর্থের সমর্থনই করছেন, এবং সেই হিসাবেই এটা ব্যবহার করছেন। কিন্তু ওই ভদ্রলোক থেকে বিপ্রপদ ঠাকুর, একটা ক্রমনির্মাণ দেখতে পাই আমরা ক্ষমতার প্রক্রিয়া রাজনৈতিক কিভাবে সাংস্কৃতিককে প্রভাবিত করছে তার উদাহরণ হিসাবে। প্রথম ভদ্রলোকের বক্তব্যের গদ্যটুকুকে আমরা হাজির করেছি এখানে তার মুখবিকৃত করা এবং ভ্যাংচানোর প্রক্রিয়াটাকে আমরা এখানে গদ্যে দেখাতে পারিনি, 'কবি' চলচ্চিত্র যা অনায়াসে দেখিয়েছিল। সেই ভ্যাংচানোর বিরক্তিটাই তার গদ্যীকৃত রূপটা পেল বিপ্রপদ ঠাকুরের বক্তব্যে, "উড়ুপ উড়ুপ উঁপ, খ্যাকোর খ্যাকোর উঁপ, চুপ রে বেটা মহাদেবা, চুপ চুপ চুপ"। এবং খেয়াল করুন, এটাও ভঙ্গী, পরিপূর্ণ গদ্যভাষার রূপ সেটা এখনও পায়নি। গানের সুরের একটা আবহকে

ধরে রেখে একটা প্রাকভাষা, ছদ্মভাষা, যা ব্যঙ্গ এবং কটূক্তিকে খুব চমৎকার হাজির করছে। 'উপ' জাতীয় নির্মাণ আমাদের খুবই পরিচিত, বানরের ধ্বনিকে সচরাচর অমনই হাজির করা হয় বাংলা গদ্যে। এবং হাজির করার অভ্যস্ত রকমটা এখানে খুবই জরুরি। কারণ, খেয়াল রাখবেন ইংরেজের কুকুর বার্ক করে, বাঙালির কুকুর করে ঘেউ। দুটোই সারমেয়কে চিহ্নিত করছে, কিন্তু দুটো ভাষার অভ্যস্ততার দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমে। এখানে বাঙালি চিন্তনের মধ্যে উপ্ত বানর-রকমটাকে ব্যবহার করছেন বিপ্রপদ ঠাকুর। তার 'কপি' মন্তব্যটা মনে আছে নিতাই কবিয়ালকে নিয়ে? তার মানে, এটা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বিপ্রপদ ঠাকুরের ক্ষমতাসীনতার অভ্যস্ত জায়গার নিরিখে এটা একটা পরিচিত প্রক্রিয়া। নিতাইয়ের বানানো গানের পংক্তির নকল কিছু পংক্তিতে তিনি সেই একই গালাগাল দিচ্ছেন নিতাইকে, যা তিনি আগেও দিয়েছেন।

উপরে তোলা সাবটাইটলের লাইনগুলোর সঙ্গে বিপ্রপদ ঠাকুরের বাংলা বাচনটাকে মেলালে একটা মজা পাবেন। দেখুন, আমার ইংরিজি জ্ঞানগম্যির অপরিসীম সামর্থের কারণে আমি বিপ্রপদ ঠাকুরের বাচনে বানর-ভঙ্গীটাকে অনুবাদ করতে পারিনি, শুধু তার মানবিক অর্থহীনতাটুকু অনুবাদ করতে পেরেছি। তাতে বিপ্রপদর আক্রমণের দাঁতনখ কিন্তু ভোঁতা হয়ে গেছে। বিপ্রপদ শুধু নিতাইয়ের পংক্তিগুলোকে অর্থহীনতাতেই পর্যবসিত করেনি, একই সঙ্গে সেটাকে বানরের মত আকারে হাজির করেছে। উপন্যাসে ভঙ্গীটা ছিল লিখিত আকারে। তাই, বিপ্রপদ ঠাকুরের কথার পরে, নিতাইয়ের কথায় নিহিত অর্থটা আলাদা করে জানিয়ে দিতে পেরেছিলেন লেখক তারাশঙ্কর। কথোপকথনটা ঘটেছিল ঠিক কবির লড়াইয়ের পরদিন প্রথম সকালে নিতাই যখন ইস্টিশনে এসে পৌঁছল।

> বিপ্রপদ হৈ হৈ করিয়া উঠিল–এই! এই! চোপ, সব চোপ!তারপর তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিল–বলিহার ব্যাটা বলিহার! জয় রামচন্দ্র! কাল নাকি সত্যি সত্যি লঙ্কাকাণ্ড করে দিয়েছিস শুনলাম। ভ্যালা রে বাপ কপিবর।
> আশ্চর্যের কথা, বিপ্রপদর পুরানো রসিকতায় নিতাই আজ অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিল, মুহূর্তে সে গম্ভীর হইয়া গেল।
> বিপ্রপদর সেদিকে খেয়াল নাই, সে উত্তর না পাইয়া আবার বলিল–ধুয়ো কি ধরেছিলি বল দেখি? 'উঁপ! উঁপ! খ্যাকোর–খ্যাকোর উঁপ! চুপ রে ব্যাটা মহাদেবা চুপ চুপ চুপ' না কি? বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।
> নিতাই এবার হাত জোড় করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল–আজ্ঞে প্রভু, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ছোট জাত; বাঁদর, উল্লুক, হনুমান, জাম্বুমান যা বলেন তা-ই সত্যি।

উপন্যাসের সঙ্গে এখানে চলচ্চিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এক, এখানে বিপ্রপদর ভূমিকায় অভিনেতা নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের শরীরে সঙ্কেতেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যা নিতাইয়ের মুখের কথায় খেয়াল করিয়ে দিতে হয়েছিল তারাশঙ্করকে, 'বাঁদর, উল্লুক, হনুমান, জাম্বুমান' ইত্যাদি। আর দুই, এটা আরও বড় একটা তফাত, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিকের অভ্যন্তরীন মিথস্ক্রিয়াটা উপন্যাসে প্রায় অনুপস্থিত। একটু ব্যাখ্যা করে নেওয়া যাক। চলচ্চিত্রে ঘটনাটা ঘটছে একজন ভদ্রলোকের আদেশ কুলি নিতাই মানতে অস্বীকার করার পর। এবং সেখানে এই রামচন্দ্র-কপি পরিপ্রেক্ষিতটাও আর উচ্চারিত হচ্ছে না। উপন্যাসে যা হচ্ছে, বিপ্রপদর 'রামচন্দ্র' 'লঙ্কাকাণ্ড' ইত্যাদি উল্লেখে। অর্থাৎ, ধর্মের ডিসকোর্সে ভগবান ও ভক্তের প্যারাডাইমে বা গঠনে সেখানে আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে নিতাই। 'বাঁদর বা হনুমান' যেখানে রামচন্দ্রের এক ভক্তের নাম, মানে এক ধরনের একটা সম্মান আছে সেই সম্বোধনের। আর চলচ্চিত্রে সেটা না থাকায়, এবং পরপর দুই ভদ্রলোকের, মানে ক্ষমতার ক্রমবদ্ধতায় হায়েরার্কিতে নিতাইয়ের চেয়ে উচ্চাসীন দুজনের পরপর দুটি আক্রমণে এখানে বাঁদর-পরিপ্রেক্ষিতটা নিতান্তই অপমানজনক, তার থেকে নিস্কৃতির কোনও উপায় নেই। এবং, নিতাইয়ের নিজের গানের পংক্তিকে বিকৃত করে বানর-ডাকে পরিণত করা হচ্ছে। যেখানে, দুই ভদ্রলোকই মহাদেব কবিয়ালের পংক্তিগুলিকে তাদের ইচ্ছিত অর্থেই বজায় রাখলেন। এখানে সাংস্কৃতিকের উপর রাজনৈতিকের আক্রমণ অস্বীকার করার কোনও উপায়ই আর থাকছে

না। অর্থাৎ, ক্ষমতার নির্মাণ/নিষ্কাশন/আত্মীকরণের প্রক্রিয়া, যার নাম রাজনৈতিক, সে অর্থ নির্মাণ/নিষ্কাশন/আত্মীকরণের প্রক্রিয়া বা সাংস্কৃতিককে নিজের মত করে বদলে দিচ্ছে, নিজের সুবিধা মোতাবেক চয়ন, সঙ্কলন, সম্পাদন করে, বা, এক কথায়, স্থানান্তর ঘটিয়ে ফেরত দিচ্ছে। আলথুসেরের এই তাত্ত্বিক কাঠামোর এর চেয়ে সুন্দর উদাহরণ আমি 'কবি' চলচ্চিত্র দেখার আগে কখনও পাইনি।

313
00:31:57,900 --> 00:32:03,500
Brahmin, so what?
Can he create songs?
Infuriates me!

> হ্যাঁ! ভারি আমার বাম্মন। কই, এমনি মুখে মুখে বেঁধে গান করুক দেকি? আগে আমার সব্বাঙ্গ জ্বলে যায়, হ্যাঁ।

'কবি' উপন্যাস আর চলচ্চিত্র দুটোতেই এটা একটা জোরের জায়গা যে, ঠাকুরঝির নিতাইয়ের প্রেমে পড়া সবরকম অর্থেই একটা প্রেমে পড়া। চলচ্চিত্রে এর আগে মেলার দৃশ্যে মনে করুন, বৃন্দাবন ঠাকুরঝির মালা কেনার সখের কথা শুনে সস্নেহে জিগেশ করছে, "মালা লিবি বউ?" এবং ঠাকুরঝি তাতে আদুরে হাঁসের মত করে ঘাড় নেড়ে (আমি আদুরে হাঁস দেখিনি, বরং আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, কলেজ স্কোয়ারের একটি দুষ্কৃতী রাজহাঁস আমায় রীতিমত তাড়া করে এসেছিল, এবং কামড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হাঁস আদুরে হলে ওরকমই করে এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত) সায় দিচ্ছে। উপন্যাসেও ছিল এই কথা। নিতাইকে রাজনের বৌ বলেছিল বৃন্দাবনকে নিয়ে।

> –রঙ পেরায় গোরো, বুঝলে ওস্তাদ, তেমনি ললছা-ললছা গড়ন। লোকটিও বড় ভাল। দুজনাতে ভাবও খুব, বুঝলে!

চলচ্চিত্রেও এই বাক্যের আগেই একাধিকবার দেখেছি আমরা বৃন্দাবনকে ঠাকুরঝির প্রতি একটা সস্নেহ প্রশ্রয় নিয়ে একটা আগলে রাখার ক্রিয়ায়। তাই কোনও অসুখী দাম্পত্য থেকে যে পরিপূরণের বা ক্ষতিপূরণের মত করে নিতাইয়ের প্রতি ঠাকুরঝির আগ্রহ এসেছিল তা নয়, এসেছিল ওই যাদু-উপাদান থেকে, "কই এমনি মুখে মুখে বেঁধে গান করুক দেকি?" এর পরের কিছু বাক্যেও একাধিকবার এসেছে 'কবি' নিতাইয়ের প্রতি ঠাকুরঝির এই বিস্ময়। পরেও এসেছে। নিতাই একটা কিছু পারে যা সাধারণ নয়, অন্যরকম। নিতাইয়ের সেই অন্যরকমত্বটাকে গোড়া থেকেই সম্মান দিয়ে আসছে কেবল দুইজন, রাজন আর ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি তাকে সবসময়েই ডাকে 'কবিয়াল' বলে। 'কবি' উপন্যাসে যেমন, চলচ্চিত্রেও তেমনি, কবিকে গোড়া থেকেই কবি বলে চিনে আসছে ঠাকুরঝির এই প্রেম। বারবার ঠাকুরঝিকে নিয়ে বাঁধা পংক্তি চলে আসছে কবিগানে, 'ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা' বা 'কাল যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে' এই দুই গানেরই আবিষ্কারের আধার ঠাকুরঝি। আমরা পরে দেখব, এই গানগুলি এতটাই ব্যক্তিগত ঠাকুরঝির কাছে যে নিতাই সেটা কবিগানের আসরে গাওয়ায় ঠাকুরঝি তাকে মন্দ লোক বলে ডাকবে। আমি এটা বলতে চাইছি না যে দাম্পত্য অসুখ থেকে সঞ্জাত প্রেম প্রেম হত না, এটাই বলতে চাইছি যে এই প্রেমটা বরং একটা বাড়তি কিছুর দ্যোতক, চিহ্নিত করছে কবিয়ালের কবিগান গাওয়ার ওই বাড়তি ক্ষমতাকে।

318
00:32:34,200 --> 00:32:41,000
(Remembers that having food or
Drink before men is impolite, and
Goes outside Nitai's vision.)

> (চা বানানোর পরে, নিতাই এবং ঠাকুরঝি দুজনেই চায়ে চুমুক দিতে যায়, এবং

> ঠাকুরঝির মনে পড়ে যায়, নিতাই সামনে রয়েছে এবং তখন সে উঠে দরজার আড়ালে গিয়ে চায়ে চুমুক দেয়।)

ঠিক এই দৃশ্যটার কথাই আগে আমরা উল্লেখ করেছিলাম। লেখক তারাশঙ্করকে যেটা ঠাকুরঝির জবানিতে বলে বা ভেবে নিতে হয়েছিল, "মেয়েদের ভাল লাগার কথা নাকি বলিতে নাই", সেটা চলচ্চিত্রকার দেবকী বসু সরাসরি দর্শককে দেখিয়ে নিতে পারেন এই দৃশ্যটা দিয়ে, আলাদা করে কোনও বক্তব্য যোগ করার প্রয়োজনই পড়ে না। এবং মেয়েদের ভোগের প্রতি স্বতঃক্রিয়াশীল এই নিষেধের নিরিখেই আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঠাকুরঝির প্রতি নিতাইয়ের যত্নের ওই বিশেষ তাৎপর্যটা, যার আলোচনা আমরা আগেই করেছি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে একটা তৃতীয় প্রবাহ হলে ভাল হয়। দ্বিতীয় প্রবাহ শুরু হয়েছিল ১৬ পাতার মাঝামাঝি প্রথমটাকে ভেঙে, আর এখন চলছে ৩৩। শুধু সেদিক দিয়েই নয়, নারী ঠাকুরঝির খুব স্পষ্ট আত্মঘোষণাগুলো এবার আসতে যাচ্ছে। এবং সেটা এতটাই উজ্জ্বল লাগে আমার যে বোধহয় একটা প্রবাহ-ভেদ এখানে ভালই যায়।

দেবকী বসুর কবি, ১৯৪৯ – তৃতীয় প্রবাহ

322
00:32:54,200 --> 00:32:55,400
My will.

> আমার মন।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি উক্তি, এবং অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। এবং সময় ও পটভূমি ভাবুন। যখন একটি নারীর ভোগের যে কোনও মুহূর্তও নিষিদ্ধ, তার সাপেক্ষে আসছে এই উক্তি। কোনও ব্যাখ্যা নেই, কোনও ভাবসম্প্রসারণ নেই। শুধু একটি উক্তি। এর আগের পরের নিতাই ও ঠাকুরঝির কথোপকথনটাকে খেয়াল করুন। বরং অভ্যস্ত অবয়বে যে ধাঁচটা আমরা পুরুষ ও নারী বলে চিনি এখানে ঠিক তার বিপরীতটা ঘটছে। যা জানে, তাই ফের ছল করে শুনতে চাইছে নিতাই, এবং স্পষ্ট দ্বর্থহীন রকমে তা উচ্চারণ করছে ঠাকুরঝি। এর আগেও আমরা নারী-পুরুষের সম্পর্কে অভ্যস্ত ক্ষমতার মানচিত্রের একটা বদল এবং স্থানান্তরের কথা উল্লেখ করেছিলাম আমরা, কিন্তু ঠাকুরঝির এই ঘোষণাটা তার চেয়েও আরও অনেক নাটকীয়। সেই ঠাকুরঝি, যার পরিচয়ই ঠাকুরঝি, নিজের কোনও নামই নেই। এবং এই বিন্দু থেকে শুরু চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব যাত্রা। যদিও তারও চিত্রনাট্য তারাশঙ্করেরই, তাই বলা কঠিন, এই পরিবর্তনের নিয়ামকটা আসলে কে। হয়তো দুজনেই। আমার ধারণা, দেবকী বসুর একটা খুব বড় অবদান আছে এখানে। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি না, কারণ দেবকী বসুর আর কোনও চলচ্চিত্রই দেখিনি আমি। অনেক বছর আগে একদিন দূরদর্শনে 'বিদ্যাপতি' দেখছিলাম, মাঝখান থেকে, একটু দেখতে না দেখতেই লোডশেডিং হয়ে গেছিল।

এবং এই আন্দাজটার কারণ ওই চলচ্চিত্রটার নাম, 'বিদ্যাপতি', যা স্বাভাবিক ভাবেই একটা অত্যন্ত সক্রিয় অণ্বিষ্টতা টেনে আনে, বৈষ্ণব সাহিত্যের। এই জগতটা যে বিরাট তা আমি জানি, তার গভীরতাও কোথাও কোথাও অনুভব করি, অল্প জেনেই বা প্রায়-না-জেনেই যতটুকু অনুভব করা যায়। আর বাঙালি হয়ে, বাঙলা বিভিন্ন উপন্যাসে লেখায় অজস্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিহ্নে এই বোঝাটা চেয়ে বা না-চেয়েও এসে যায় খুব সততই। আমি বৈষ্ণব সাহিত্যে একটা বইই যত্ন নিয়ে পড়েছিলাম একসময়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের, 'চৈতন্যচরিতামৃত'। তাও 'পড়েছিলাম' এই শব্দটাতেও একটা বোকা স্পর্ধা এসে যায়, এত বেশি জায়গা এত কম অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। এবং মজার কথা, 'কবি' চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে আমার মাথায় গোড়া থেকেই বারবার আসছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বাংলা ভাষায় যাকে প্রথম সার্থক গ্রন্থ-রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছিলেন সুকুমার সেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অধ্যায়ভাগ, গঠন ইত্যাদিকে মিলিয়ে। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবনকাহিনী ভারি উত্তেজক। একজন খুব উঁচু মাপের নিতাইয়ের গল্প তাকে বলা যায়

অনেকটা। কাফকার বহু প্রজন্ম আগে, চেকোস্লোভাকিয়া কেন, প্রুশিয়া জন্মেরও আগেই বোধহয়, নিজের লেখাকে নিজেই নষ্ট করে ফেলার দিকে যেতে হয়েছিল তাকে, গূঢ় বৈষ্ণব তত্ত্ব বাংলায় লিখে ফেলায় উঁচু-জাতের কুলীন বৈষ্ণবদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এতদূর গেছিল। আর কৃষ্ণদাস তো আদৌ কবিরাজ ছিলেন না। তিনি ছিলেন কৃষ্ণ দাস। যতদূর মনে পড়ছে তিনি ছিলেন নিচু জাত, বোধহয় কৈবর্ত, তিনি এসেছিলেন বৈষ্ণব পণ্ডিতদের ভৃত্য হিসাবে। তাঁর অলৌকিক সাফল্যের পরিচয়টা এখানেই যে লোকে তাঁর কাব্য ভালবেসে যে অভিধা দিয়েছিল, 'কবিরাজ', সেটাই আজ তাঁর নাম হয়ে গেছে। ভেবে দেখুন, নিতাই হয়ত জানতও না কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম, কিন্তু নিতাই যা করতে চাইছিল তারই চূড়ান্ত একটা পারার দৃষ্টান্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সেই 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের 'রাধা-কৃষ্ণ' যুগল-রূপ বিষয়ক তত্ত্বগুলো মনে পড়ছিল আমার। চৈতন্যকে ঘিরে নারী-পুরুষ এই দুই সত্তার পারস্পরিক স্থানান্তর নিয়ে এত বেশি কিছু আছে সেখানে যে মাথায় না-আসাটাই অসম্ভব। গোটা চৈতন্য ডিসকোর্সেই আছে। কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণের বিপরীতে রাধার মত গৌরবর্ণ গৌরচাঁদের ভক্তিতে নারী-আকার এবং পুরুষ-আকার দুয়েরই উপস্থিতি নিয়ে বহুকিছুই আছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। নিতাই এবং ঠাকুরঝিকে ঘিরে যা যা নারী-পুরুষ অভ্যস্ত মানচিত্রের বৈপরীত্য ঘটছে তার একটা সূত্র হিসাবে খুব জোরালো ভাবেই আমার মাথায় আসছে বৈষ্ণব-সাহিত্যের কথা। এবং তাই 'বিদ্যাপতি', এবং তাই দেবকী বসু। কিন্তু দুদিক থেকেই এই আলোচনায় আর অগ্রসর হওয়ার পক্ষে এই মুহূর্তে অযোগ্য আমি, দেবকী বসুও আর দেখিনি, এবং বৈষ্ণব সাহিত্যও কিছু জানিনা। বরং খুব কেজো একটা প্রাকৃত উদাহরণ দেওয়া যাক এই নিয়ে, এবং তাতে একটা আত্মসমালোচনাও থাকবে।

অনিন্দ্য এবং আমি 'কবি' চলচ্চিত্রটা দেখাকালীন একাধিকবার নিজেদের মধ্যেই, দুজনে দুজনকে বলেছি, রবীন মজুমদারকে কেমন অযৌন, অ্যাসেক্সুয়াল লাগছে বারবার। এর বিপরীতবিন্দুটা মাথায় এল আজ সকালে ব্যায়াম করতে করতে, এমপিথ্রি প্লেয়ারে বাজছিল 'গীতগোবিন্দ'। চন্দ্রিল (ভট্টাচার্য) কিছু কিছু জিনিষ এমন মোক্ষম লেখে। প্রথম লাইনটাই হল, "তোমাকে দেখাব নায়াগ্রা, তোমাকে শেখাব ভায়াগ্রা, তোমাকে করব আদরআত্তিযত্নম"। আদরআত্তিযত্নম, মানে যত্ন, আসছে বটে, কিন্তু সেটা নায়াগ্রা প্রপাত দেখানোর এবং ভায়াগ্রা ব্যবহার শেখানোর পরে, এবং দেখায় বা শেখায় তো পুরুষই। নায়াগ্রা ফলস দেখানোর উপমাটা এখানে অপ্রতিরোধ্য। আমার ক্লাস সেভেনের এক সহপাঠী আমায় বলেছিল, তখনকার চলচ্চিত্র-অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে বাংলা চলচ্চিত্রের একজন গাম্ভীর্য ও পৌরুষের প্রতীক বাচক অভিনেতা সম্পর্কে, জানিস, উনি হস্তমৈথুন করলে বীর্য হয় এক বালতি। তখন গাম্ভীর্যের সমাস ছিল 'গামলা-ভর্তি-বীর্য'। পৌরুষ ও গাম্ভীর্যের সহাবস্থানটা তো বোঝাই যাচ্ছে, ওই অভিনেতার উপমায়, বাংলা চলচ্চিত্রের সূত্রে তিনি ছিলেন পৌরুষের প্রতীক। এই পৌরুষের পটভূমিতেই তৈরি হয়েছিল আমাদের পুরুষ মন। এর সাংস্কৃতিক ফলাফলটাও চিহ্নিত আছে চন্দ্রবিন্দুরই অন্য একটি গানের, 'কেউ ভালবেসে', একটা লাইনে, "সুচিত্রা কেঁদে মরে, উত্তম হেসে যায়, আর প্রেমরসে ডুবুডুবু সুতানুটি ভেসে যায়।" ওই গাম্ভীর্য থেকে উত্তমের হাসি এটাও একটা পরিবর্তন, কিন্তু সেখানেও প্রেম ও রোমান্সের সূত্র ওটাই, অভিমানী নায়িকা কেঁদে যাবে, আর আত্মবিশ্বাসী নায়ক হেসে হেসে ভোলাবে। তবে উত্তমের হাসিটাও ছিল কিছু, সে কথা বলতেই হবে। এর একদম বিপরীত বিন্দুটা হল 'কবি' চলচ্চিত্র, এটায় উচ্চকিত সশব্দ হাসি যে কবার আছে, সঙ্গে ছপণ কড়ি নিয়ে গুণতে গুণতে দেখবেন ফিল্মটা, সে সবকটিই হয় ঠাকুরঝি নয় বসন, রাজনও আছে, কিন্তু একবারও নিতাইয়ের নয়। বরং নিতাই মুচকি হাসি ছাড়া কিছু তো হাসেই নি, বহুসময়ই বেশ করুণ থেকেছে, প্রায় কাঁদো-কাঁদো। এবং, গোটা চলচ্চিত্রে, দুই নায়িকার একজনও, ঠাকুরঝি বা বসন, একবারও স্বাভাবিক আবেগ থেকে কাঁদেনি। ঠাকুরঝি একবার কেঁদেছে, সে ওঝার হাতে নির্মম মার খেয়ে, একদম শারীরিক বেদনার কান্না।

এরকমই কোনও ছক, নিজের কাছে অসচেতন কিন্তু মাথার পিছনদিকে প্রবাহিত কোনও পৌরুষের বিম্ব থেকেই অনিন্দ্য বা আমি প্রতিকৃত হইনি তো – অনিন্দ্যর আর আমার বাল্য-কৈশোর সময়গত ভাবে অনেকটা পৃথক, কিন্তু বাঙলা সমাজ তার ভিতর অত কিছু বদলে যায়নি বলেই আমার মনে হয় – এই

চিন্তাটা আমার মাথায় এল ঈপ্সিতার কিছু কথার সাপেক্ষে। যেদিন আমার বন্ধুর মেয়ে আত্মহত্যা করল, আমি খুব খারাপ ছিলাম, লিখতে পারলাম না আর, মেল পাওয়ার পরে ঈপ্সিতা ফোন করেছিল একাধিকবার, সেই সুদূর ওয়াশিংটন থেকে। আমি ছিলাম না, বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পর আবার করল, ওরও খুব কষ্ট হচ্ছিল সংবাদটায়, এবং ওর কথায় ঠিক সেটাই হল, যেটা সবচেয়ে কাজ করে একটা মানুষ কষ্টে থাকলে, অন্য অনেকের একই রকম কষ্টের কথা মাথায় আসা। ও আমায় বলেছিল, দীপঙ্করদা তুমি গুণে উঠতে পারবে না, কত এরকম ঘটনা ঘটে চলেছে রোজ, সব খবরও তো আসে না। ওর কথা শুনতে শুনতে আমার মাথায় আসছিল গোটা বাস্তবতাটা। নিজের মেলটার কথা মনে পড়ল, সেখানে ওর আত্মহত্যার কথা বলার পরেই যোগ করে দিয়েছিলাম, ও ছিল সমকামী। এবং এই বাক্যাংশটুকুই কী অদ্ভুত এবং নির্মম ভাবে পরিস্থিতিটাকে ব্যাখ্যা করে দিল। "ওর এই মেয়ে ছিল সমকামী, তাকে নিয়ে অনেক চাপ নিতে হত ওকে, ওদের পরিবারকে, আমার এই বন্ধুকে" – ঠিক এই বাক্যটাই লিখেছিলাম, আর কাউকে ব্যাখ্যা করতে হয়নি কী চাপ কেন চাপ ইত্যাদি। অথচ ও আমার বন্ধুর মেয়ে, তার যৌন-অভ্যাস একান্তই তার ব্যক্তিগত বিষয়, তা তো আমার কাছে প্রাসঙ্গিক তথ্য হয়ে ওঠার কথা নয় আদৌ। আমি তো অসভ্যতা আকারে করিনি, আমার বা অন্যের কাছে এটা প্রয়োজনীয় তথ্যই হয়েছিল পরিস্থিতিটাকে বোঝার, অথচ গোটাটা কী ভয়ঙ্কর একটা সামগ্রিক অসভ্যতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অসভ্যতা, নির্মমতা। সেই রাতে আমার বন্ধুর বাড়িতে যে গেলাম, সেখানেও বেশ কিছু বেদনার উপাদান ছিল, যাকগে।

এদিন অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম ঈপ্সিতার সঙ্গে, ফোনে। কথা বলতে একটা আরামও পাচ্ছিলাম। ততক্ষণে, ওদের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে, আমার একটু স্বাভাবিকও লাগছিল। আমরা কথা বলছিলাম এই নির্মম অসভ্যতা নিয়েই। ও বলছিল, ও নারী-পুরুষ এই দুই পরিচিতি, তার নানা সমস্যা, পরিচিতি পরিবর্তনের আকাঙ্খা বা বেদনা, তাদের বিভিন্ন যৌন অভ্যাস, তার উপরে সামাজিক অত্যাচার – এগুলো নিয়ে ও লেখে এই কারণে ওর ওয়েবসাইট বা পত্রিকার বন্ধুরা কেমন পরিহাসমূলক কটাক্ষে বলে থাকে, এটা তো হিজড়েদের সাইট, বা হিজড়েদের পত্রিকা, ইত্যাদি। এগুলি পরিহাস, কিন্তু তার মধ্যে তো আক্রমণের রক্তাক্ততা একটুও কম থাকে না। অনিন্দ্য বা আমি, আমরাও তো পরিহাসই করছিলাম, কিন্তু আসলে এগুলো ওরকম কোনও পৌরুষশালী অবস্থানের অভ্যন্তরীণ হিংস্রতা বেয়ে আসেনি তো? যে অবস্থান আমাদের মধ্যে ঢুকে এসেছে আমাদের বাল্যে কৈশোরে, চিন্তা নিয়ে চিন্তা শুরু করার অনেক আগে থেকেই। সেই অবস্থানই তো বারবার বারম্বার ঘুরে ঘুরে আসে আমাদের সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, জনপ্রিয় বিম্বে। নায়িকারা কাঁদে, নায়কেরা হাসে। যে নায়ক যে নায়িকাকে পৌরুষ দেখিয়েছে, এবং যৌনতা শিখিয়েছে। 'কবি'-র ঠাকুরঝি ও বসন, নিতাইয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, এই অবস্থান থেকে বেশ অন্যরকম একটা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে বেশ কিছুবার, চলচ্চিত্র চলাকালীন। এবং যেমন বলেছি, উপন্যাসে হয়ত এর ভ্রূণটা ছিল, কিন্তু এই যাত্রাটা একান্তভাবেই চলচ্চিত্রের। ঠাকুরঝি বলেছিল "আমার মন", কিন্তু আজও কটা মেয়ে সেটা বলে উঠতে পারে, বা বললেও শোনে সবাই, শুনে উঠতে পারে? আমার ঘোর সন্দেহ, 'কবি' চলচ্চিত্রে অভ্যস্ত অবস্থানের এই বৈপরীত্য এসেছিল শুধু বদলাতে থাকা সময়ের প্রভাবে নয়, বাঙলার সনাতন সংস্কৃতি, বৈষ্ণব সাহিত্য ইত্যাদি এখানে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সেটা কাজ করেছিল তারাশঙ্করের অভ্যন্তরেও। শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই আলোচনার, ডিসকোর্সেরই একটা বেশ বড়, জটিল, বহুস্তরিক এবং নিবিড় সম্পর্ক আছে 'কবি'-র 'কবি' হয়ে ওঠায়। কিন্তু সেই বিশ্লেষণের যোগ্যতাও আমার নেই, এবং এটা বোধহয় তার জায়গাও নয়।

323
00:32:56,500 --> 00:32:57,200
Your will?
324
00:32:57,350 --> 00:32:59,500

Yes, my will. So what?
325
00:33:01,600 --> 00:33:08,800
I was thinking: If I became a kabial,
Why I came from a low caste?

> তোমার মন?
> হ্যাঁ, আমার মন। তো কী?
> আমি ভাবছি ঠাকুরঝি, আমি যদি কবিয়াল হলাম তো নীচ কুলে জন্মালাম কেনে?

খেয়াল করুন, ঠাকুরঝির কাছ থেকে "আমার মন" এই উত্তর এসেছিল নিতাইয়ের প্রশ্নেই। তারপর, উত্তরটা ঠিক শুনছে বা বুঝছে কিনা তা বুঝতে, নিতাই ফের প্রশ্ন করল, "তোমার মন?", তাতে আবার উত্তর দিল ঠাকুরঝি, "হ্যাঁ, আমার মন। তো কী?" মন মানে ইচ্ছা, বাসনা। নারীর এই উন্মুক্ত বাসনার সামনে অস্বস্তিগ্রস্ত, নিরুত্তর হয়ে পড়ছে নিতাই। সে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে নিয়তির বাধ্যতার প্রশ্নে। বাসনা পরিপূরণের পথ যে নিয়তির দ্বারাই অবরুদ্ধ সেই জায়গায় সরে যাচ্ছে। ব্যক্তি নিতাই এই উত্তরের ঘাতটা নিজের দিকে আসতেই দিচ্ছে না। এর পরের বাক্যগুলোতেও সেই নিয়তি-বিষয়ক পথেই এগোচ্ছে কথোপথন। আমি এর সাথে বেশ মেলাতে পারি পুরুষের ব্যক্তিগত অস্বস্তিকে। এত দেখেছি, এত দেখি আমরা চারপাশে, নারীর উন্মুক্ত বাসনার চোখে তাকাতেই পারে না পুরুষ অবস্থান। নারীর বাসনা উন্মুক্ত হলেই সে হয়ে যায় ছেনাল, বা ডাইনি, বা ওইরকম কিছু। পুরুষ অবস্থান এই ছকটাতেই অভ্যস্ত যে বাসনাটা তার নিজের দিক থেকেই জাগবে, নারী সেটা পরিপূরণ করবে, বা আরও সঠিক ভাবে বললে, নারীর আধারে সেটা পরিপূর্ণ হবে। নারীর বুক থেকে দুধ খেয়ে তার বাসনার জন্ম হয়েছিল, নারীর যোনিতে তার বাসনার পরিপূরণ। সে পুরুষ যখন বাসনাগ্রস্ত হয়, নারীশরীর থেকেই সেই বাসনার পরিতৃপ্তি। নারী এখানে নারীশরীর। যেই নারীশরীর শুধু শরীর রইল না, তার একটা সত্তা স্পষ্ট উচ্চারিত হল, যে সত্তার নিজস্ব বাসনা আছে, তার সঙ্গে আর কথোপকথনেই আসতে পারছে না পুরুষ অবস্থান।

ঠাকুরঝির স্পষ্টতার ধারেকাছেও নয়, তবু একরকম একটা উচ্চারণ আসবে নিতাইয়ের, নিজের ইচ্ছার। অনেক পরে। ঠাকুরঝির উপর ওঝার অত্যাচারের তীব্র সঙ্কটের মুহূর্তে, রাজনের প্রশ্নে, সে উত্তর দেবে, হ্যাঁ, সে ঠাকুরঝিকে ভালবাসে, কিন্তু সেই বাক্যেও থাকবে একটা 'কিন্তু'। এই 'কিন্তু' বেয়ে সে চলে যাবে, 'জাত', 'ঘর' ইত্যাদি প্রশ্নে। তার নিজের বাসনার একটা পরোক্ষ উল্লেখ থাকবে, যখন নিতাই রাজনের কাছে বলবে, বৃন্দাবনের ঘর সে ভেঙে দিতে চায় না, তাহলে বৃন্দাবনের বুকে সেই একই ব্যথা বাজবে, যা তার নিজের হচ্ছে। এই বেদনা হচ্ছে কেন? বাসনা অপরিপূরণে। তাই এই ভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে নিতাইয়ের বাসনা। কিন্তু তাও দেখুন, 'জাত', 'বিয়ে' বা 'ঘর' ইত্যাদি সামাজিক ভাবে প্রদত্ত ধারণার নিরিখে। মুক্ত স্বতন্ত্র একটি ব্যক্তির নির্জলা বাসনার আকারে, যে ভাবে এসেছিল ঠাকুরঝির উচ্চারণ, আদৌ সেটা আসে না পুরুষ-অবস্থান থেকে। এই জায়গাটা বারবার ভাবায় আমায়, সামাজিক অভিজ্ঞতার নিরিখেও। আমার মনে হয়, সিমোঁ দ বোভোয়ার নিতান্ত ভুল দিয়েছিলেন বইয়ের নামটা। নারী সেকেন্ড সেক্স নয়, ফার্স্ট সেক্স। প্রথম লিঙ্গ নারী। যেখান থেকে নারী বা পুরুষ দুই লিঙ্গই জন্মায়। আমার ভীষণ ঈর্ষা হয় নারী অবস্থানকে, যে জন্ম দেওয়ার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। একটিও মৌলিক পুরুষ অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা নেই যা নারীর হতে পারে না কিছুতেই। কিন্তু দুটি মৌলিকতম অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নারীর আছে যা কিছুতেই পুরুষের হতে পারে না। এক, গর্ভধারণ ও জন্ম দেওয়া। আর দুই, স্তন্যপান করানো। আমার নিজের ভিতর এই নিয়ে একটা বিষণ্ণতাও বোধহয় আছে, যার একটা ছায়াপাত ছিল, যতদূর সম্ভব, 'সোনার গল্প' নামে আমার একটা আখ্যানে (http://ddts.randomink.org/bangla/bn-stories.html)। এসব নিয়ে বহু কিছু মাথায় আসে আমার। ভাইস-ভার্সা নামে মার্জরি গার্বরের একটা বইয়ের সূত্রে তা লিখবও ভেবেছিলাম একসময়, লেখা হয়ে ওঠেনি। যাক গে। 'কবি'-র কথায় ফেরা যাক।

নিতাই কবিয়াল, মানুষ হিসাবেও তার একটা মূল্যবোধ আছে। তাই ঠাকুরঝি তার কাছে ডাইনি হয় না, এমনকি ওঝা ডাইন-শাসনের চিকিৎসা করার পরেও। সে হয়ে যায় চাঁদ, "চাঁদ তুমি আকাশে থাকো/ আমি তোমায় দেখব খালি/ ছুঁতে তোমায় চাইনা ওহে চাঁদ/ তোমার সোনার অঙ্গে লাগবে কালি" এই গান গাইতে গাইতে সে গ্রাম ছেড়ে বিদায় নেবে। হয়তো এই আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়াটাও এসেছিল সেই শাক্ত যোগাযোগে, শক্তি-উপাসনার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত রকমেই। শক্তি উপাসনা নিতাইয়ের কাছে ভারি মহিমার একটা জায়গা, ভক্তির। এমনকি ঝুমুরগানের আসরের মত বেমানান জায়গাতেও, মদ খেয়ে অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্ত অব্দি সে গেয়ে গেছে "ক-এ কপালিনী, খ-এ খপ্পরধারিনী" ইত্যাদি মাতৃকা নামের গান। এবং এই উচ্চতায় তুলে দেওয়ার মধ্যেও পুরুষ অবস্থান থেকে অভ্যস্ত যৌনতার সেই মৌলিক অবস্থান একটা ছায়া ফেলে। পুরুষ নারীর সত্তার সঙ্গে কথা বলতে পারে না, নারী তার কাছে শরীর মানে বস্তু হয়ে আসে, কারণ তার কাছে বাসনা মানেই শরীরের প্রতি বাসনা, সত্তার প্রতি নয়। তাই শরীরি মলিনতা দিয়েই তাকে নিজের দূরে চলে যাওয়াকে ব্যাখ্যা করতে হয়, দ্বিতীয় ভাগের ১২ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে গিয়ে, "ছুঁতে তোমায় চাই না ওহে চাঁদ/ তোমার সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।" (এই গানটা 'চাঁদ তুমি আকাশে থাকো', দ্বিতীয় ভাগের ১২ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে শুরু, গোটা 'কবি' চলচ্চিত্রে আমার সবচেয়ে প্রিয় মুহূর্ত, এবং শুনতে গেলেই মনে হয়, রবীন মজুমদার ছাড়া আর কেউ পারত এটা গাইতে?) এই চাঁদ ও কলঙ্কের একটা প্রেক্ষিত তার আগেই থাকবে নিতাই ও ঠাকুরঝির কথোপকথনে। ঠাকুরঝিকে নিতাইয়ের দেখতে থাকার সূত্রে প্রথম ভাগের ৫৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডের শেষদিকে আসবে "চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে/ কে দেখে না চাঁদ?" অর্থাৎ, এই চাঁদ ও সম্পৃক্ত কলঙ্কের প্রসঙ্গে পিতৃতন্ত্র ইতিমধ্যেই সদাসর্বদা উপস্থিত – সেই প্রশ্ন, লোকে কী বলবে? এই লোক শব্দটা তো সত্য অর্থেই একটা প্রতীকী উপস্থিতি।

ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাইয়ের এই চালু কথোপকথনেই, এর পরের বাক্যগুলিতেই, খেয়াল করুন, যে স্বীকারোক্তি এত অনায়াসে আসে ঠাকুরঝির কাছ থেকে, তা কিছুতেই বলে উঠতে পারে না নিতাই। ঠাকুরঝি তার জন্য রাগ করে, অনুনয় করে, অভিমান করে। কিন্তু নিতাই তার নিজের সঙ্কোচ ছেড়ে বেরোতে পারে না। এটাও আমাদের অভ্যস্ত পুরুষ-নারী রকম থেকে খুবই আলাদা, প্রেম ও প্রেমের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে বা চলচ্চিত্রে, যা ঘটে থাকে। এবং সাহিত্য বা চলচ্চিত্র তো নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেই চায়, তার মানে, জীবনে যা ঘটে থাকে, বা, সঠিক ভাবে বললে, জীবনে যা ঘটে থাকে বলে পাঠক-মন বা দর্শক-মন যা বিশ্বাস করে। ঠাকুরঝি চলে যাওয়ার আগে শেষ অব্দি সেটা বলে কবিয়াল, সেটা শুনে নেওয়া যাক।

336
00:33:50,300 --> 00:33:56,700
You and me - we were both born.
But, why born to different castes?

তুমি আমি সংসারে জন্মালাম, তো ভিন্ন জাত হয়ে জন্মালাম কেনে?

এই প্রশ্নের পর দুজনেই কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকে, এবং তার মধ্যেই ফ্রেমের বাইরে থেকে অফ ভয়েসে রাজনের গলা ভেসে আসে, সে নিতাইকে ডাকছে। নিতাইয়ের প্রশ্নটাকে খেয়াল করুন, প্রশ্নটাই বদলে গেছে। ভিন্ন জাতে জন্মালে প্রেম থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই নিয়তি, এটা সে মেনেই নিয়েছে। সে ইতিমধ্যেই নিজের প্রেম থেকে সরে গেছে, সরে গেছে নিজের জন্মে, নিজের জাতে। সে ভাবছেও এই জন্ম ও জাতে বর্গীকৃত বাস্তবতা দিয়েই। চারপাশের পিতৃতন্ত্রের বাস্তব শুধু আর নিতাইকে শাসন করছে না, শাসন করছে নিতাইয়ের চিন্তাকেও। নিজের ব্যক্তিগত আবেগ ও শরীরি অনুভূতি দিয়েও সে আর তার বাইরে যেতে পারছে না। নিজেকে নিজের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রেও সে ঠাকুরঝির চেয়ে দুর্বল। এই দুর্বলতা এসে থাকতে পারে তার নড়বড়ে জাতি-অবস্থান থেকেও। সে জাতিতে ডোম, কিন্তু হয়ে উঠতে চাইছে কবিয়াল, যা ঘটে উঠতে পারে একমাত্র ওই পিতৃতন্ত্রের মধ্যস্থতাতেই।

এখানে নিতাইয়ের এই অস্পষ্টতা আর একটা সূত্র থেকেও এসে থাকতে পারে, সেটা লেখক তারাশঙ্করের চিন্তা ও সমাজ বাস্তবতার দর্শন, এবং তার সাপেক্ষে তার নিজের অবস্থানকে তিনি কী ভাবে দেখতেন। এর একটা ইঙ্গিত আমরা আগেও দিয়েছি, ওই কবি ও পোয়েট শব্দের তুলনার সূত্রে। আমার নিজের যা মনে হয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্যে তথা লোকাচারে একটা বিরাট অধিকার ছিল তারাশঙ্করের, যার প্রমাণ ছত্রে ছত্রে রয়েছে তাঁর ছোট গল্পগুলিতে। এবং এত রক্ত মাংসে জীবন্ত সেগুলো। নিচু জাতের মানুষদের বিষয়ে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাকে ওই অধিকার দিয়েছিল, সেই বাস্তবতা যা সব সময়েই পিছলে যেতে থাকে পিতৃতন্ত্রের কাঠামো থেকে। এবং বাংলার এই নিচু জাতের মানুষের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের একটা প্রসার ছিল। দীনেশ সেনের বৃহৎ বঙ্গে যেমন আছে, ব্রাহ্মণ্যের অত্যাচারে যারা বৌদ্ধ হয়েছিল, তারাই পরে বৈষ্ণব হয়, এবং তাদেরই একটা বিরাট অংশ পরে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। মুসলিম ধর্মের সঙ্গে মুণ্ডিত মস্তকের কোনও সম্পর্ক না থাকার পরেও, হিন্দুদের মধ্যে মুসলিমদের 'লেড়ে' বা 'নেড়ে' ডাকার এটাই বোধহয় ব্যাখ্যা। এর আগে ম্যাথরানি তথা মেথর শব্দেও এই প্রসঙ্গটা একটু এসেছিল। আমার সেই কৈশোর বয়সেও তারাশঙ্করের সাহিত্য অনেক বেশি জীবন্ত লাগত, শরৎচন্দ্রের অন্নদাদিদি, সব কিছুর পরও, মুসলিম হয়ে জীবন কাটানোর পরেও, স্বামীর মৃত্যু হওয়া মাত্র ফিরে যায় হিন্দু ধর্মের আচার-ব্যবস্থায়, কিন্তু তারাশঙ্করের রাইকমল বা বেদেনীদের চিরকালই এর চেয়ে অনেক বেশি জ্যান্ত লাগত। তারাশঙ্করের লেখায় বৈষ্ণব ধর্মের উন্মুক্ততাটা সব সময়েই অনেক বেশি রক্ত মাংসের একটা রূপ নিয়ে আসত। একদিকে সেই উন্মুক্ততা, অন্য দিকে সমাজের ক্ষমতার হাত ধরে কবিয়াল হয়ে ওঠার টান, এই দুইয়ের মধ্যে একটা লড়াই ইচ্ছে করেই রেখেছিলেন তারাশঙ্কর, এটা একটা ব্যাখ্যা। এটা হতেও পারে, কারণ, এই উপরের কথোপকথনটা একান্তই চলচ্চিত্রের নিজস্ব, কিন্তু প্রায় এই একই টানাপোড়েন ছিল উপন্যাসেও। এটা হতে পারে, কিন্তু আমি এটায় খুব বেশি জোর পাই না। ইচ্ছে করে যদি নিতাইকে অমন নড়বড়ে করতেন তারাশঙ্কর, তাহলে সেটা অনেক বেশি উচ্চারিত হত বলেই মনে হয়। আর প্রায় একই রকম একটা সাংস্কৃতিক নড়বড়েপনার শিকার হিসাবে তারাশঙ্করকেই আমরা আলোচনা করেছি ওই কবি-পোয়েট সূত্রে।

আর, আর একটা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। যেটা আর একটু অস্বস্তিকর। সেটা হল, সমাজ কাঠামো ও ক্ষমতার পিতৃতন্ত্রের সাপেক্ষে তারাশঙ্করের নিজের অবস্থান, এবং সেটাকে নিজের কাছেই গ্রহণযোগ্য করে তোলার মত একটা সমাজ দর্শন, যা তারাশঙ্কর নিজের মধ্যেই বানিয়ে তুলেছিলেন, তার সঙ্গে শিল্পী হিসাবে তার দেখা অনুভব করা ও বোধের লড়াই। নিজে বহুকিছু দেখছেন, অথচ দেখতে চাইছেন না, অন্য কিছু তাকে দেখাতে হবেই, তার সামাজিক অবস্থান তাকে সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এই দুয়ের মধ্যেকার একটা কাটাকুটি। 'অশ্লীল' শব্দের সূত্রে সেটাও আলোচনা করেছি আমরা। এবার নিতাইয়ের দিকে তাকান, সে তার দেহের সংকেতের বাইরে চলে যাচ্ছে, নিজের ব্যক্তি আবেগকেও অস্বীকার করছে। অথচ, ওইরকম নিবিড় একজন শিল্পী হয়ে তারাশঙ্করের এটা চোখে না পড়া অসম্ভব যে জাত কিভাবে ভাঙে, জ্যান্ত রকমে জ্যান্ত যৌনতায়। কোথায় পড়েছিলাম মনে করতে পারছি না, কোনও নৃতত্ত্বের বই, ডেভিড স্ট্যানার্ড হতে পারে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কখনও টানা একটা প্রজন্ম বা পঁচিশ বছরও কাটেনি যে দুই নরগোষ্ঠী পাশাপাশি থেকেছে অথচ রক্তমিশ্রণ ঘটেনি। এই তারাশঙ্করেরই গল্পগুলো ভাবুন, বা 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' ইত্যাদি। সেই কাহারদের ঘরে ফর্সা ফর্সা বাচ্চার কাহিনী, বা সেই দুর্গা, দুর্গাই তো, গ্রামের নিজস্ব বেশ্যা, যার সঙ্গে পুলিশেরও যোগাযোগ ছিল, ছিরু পাল একমাত্র যাকে ভয় পেত। তাহলে নিতাই কেন একবারও পারল না তার নিজের যৌনতার প্রতি সত হতে? সে কিছু মূল্যবোধ বহন করছে, যা থেকে চ্যুত হলে ব্রাহ্মণ্যের পিতৃতন্ত্র তাকে আর 'কবিয়াল' করবে না, নাকি এ আরও গভীর কিছু। নিতাইয়ের সঙ্গে নিজের কাছে নিজের লেখক-পরিচিতি, বা আইডেন্টিটি, একভাবে সংযুক্ত হয়ে যাওয়ায় তারাশঙ্করেরই কোনও সামাজিক অবস্থান, যা কোথাও একটা জাতপাতের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার অবস্থানকে সমর্থনই করে? একটু দেখে নেওয়া যাক উপন্যাস থেকে।

উপন্যাসে আছে, ঝুমুর দলে যোগ দেওয়ার এবং সেখানে ঝুমুরগানের কবিয়াল হিসাবে সাফল্যের পরপরই

নিতাই একদিন গেল রাধাগোবিন্দ মন্দিরে। চলচ্চিত্রেও খেয়াল করবেন, নিতাই ঝুমুরদলে যোগ দিতে এসেই, সেই মুহূর্তেই, জিগেশ করেছিল, কাছাকাছি কোনও রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে কিনা। তারপরে একটা মন্দিরে তার একটা গানও ছিল, 'প্রেমের কাজলকালো রাধার নয়নচাঁদে, ধরিতে হিয়ার মাঝে আমার পরান কাঁদে'। সেখানে গায়ক নিতাইয়ের কাছেই একজন মহান্তও দাঁড়িয়ে ছিলেন আবছায়া অন্ধকারে। আমার ধারণা, এর পরে, উপন্যাস থেকে যে অংশটা আমরা তুলতে যাচ্ছি এটা এক ভাবে আনার পরিকল্পনায় ছিলেন দেবকী বসুও। কারণ, ছেঁড়া সুতো গোটা চলচ্চিত্রে প্রায় নেইই, ওই আগে আমরা যেটা উল্লেখ করেছি, কুলিগিরি-রামায়ণ সূত্রে, সেটা ছাড়া। কতটাই পরিপাটী চলচ্চিত্রটির গঠন, যে খেয়াল করবেন, একটা দীর্ঘ গানহীন নাচের দৃশ্য চলছে বসনের, তার ভিতরেও হঠাৎ একবার মুখ বাড়িয়ে চলে যায় বৃন্দাবন। তখন মনে হয়, কী হল এটা। পরে বোঝা যায়, বেশ খানিকটা পরে, যখন তার নিজের মাকেও জানায় বৃন্দাবন যে সেদিন নাচের আসরেও সে খুঁজতে গিয়েছিল বৌকে, কিন্তু পায়নি। তাই, আলপটকা আচমকা ওরকম রাধাগোবিন্দ মন্দিরের প্রসঙ্গ তুলবেই বা কেন নিতাই, এবং সে যখন গাইছে তখন একটি সম্পূর্ণ অব্যাখ্যাত চরিত্র কাছে দাঁড়িয়েই বা থাকবে কেন। যাই হোক, উপন্যাসে সেই মন্দিরে নিতাই গান গেয়ে ওঠার পর, মোহান্ত তার গানের প্রশংসা করেন। সেখানে অনেক কথা হয় নিতাইয়ের সঙ্গে। নিতাই জানায় যে তার জন্মও হীন, নীচ কুলে জন্ম, আবার কর্মও হীন, সে ঝুমুর দলের বেশ্যাদের সঙ্গে থাকে। তখন অনেক কিছু বলেন মোহান্ত। তার কিছুটা তোলা যাক।

> তারপর বলিলেন–কর্ম তোমার অতি উচ্চ কর্মই বাবা। তোমার ভাবনা কি! যাঁরা কবি, তাঁরাই তো সংসারে মহাজন, তাঁরাই তো সাধক। কবির গানে ভগবান বিভোর হন। চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনে মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হয়ে নাচতেন। ... প্রভুর সংসারে নীচ কেউ নাই বাবা। নিজে, পরে নয়–নিজে নীচ হলে সেই ছোঁয়াচে পরে নীচ হয়। নীল চশমা চোখে দিয়েছ বাবা? সূর্যের আলো নীলবর্ণ দেখায়। তোমার চোখের চশমার রঙের মত তোমার মনের ঘৃণা পরকে ঘৃণ্য করে তোলে। মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবীর উপর রাগ করে মানুষ আত্মহত্যা করে মরে। আর বেশ্যা? বাবা, চিন্তামণি বেশ্যা–সাধক বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু।

এই বৈষ্ণব অবস্থান বারবার ফিরে ফিরে এসেছে, তারাশঙ্করের নানা লেখায়, কাহিনীতে, উপন্যাসে। আর লেখক তারাশঙ্কর নিজে, জাত নিয়ে কী ভাবছেন সেটাও দেখা যাক, লেখকের নিজের জবানিতে, অন্য কারুর নয়। কিছুতেই যখন ঝুমুরদলের মত করে গান গাইতে পারছে না নিতাই, বসনের হাতে চড় খাওয়ার পরে, নিতাই গেল মদ খেতে। তার প্রথম বার মদ খাওয়ার পরে নেশার বিবরণটা একটু পড়ে নেওয়া যাক।

> সব যেন দুলিতেছে। ভিতরটা জ্বলিতেছে; দুনিয়াটা তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে! এখন সে সব পারে। সে কালের ভীষণ বীরবংশী বংশের রক্তের বর্বরত্বের মৃতপ্রায় বীজাণুগুলি মদের স্পর্শে–জলের স্পর্শে মহামারীর বীজাণুর মত, পুরাণের রক্তবীজ হইয়া অধীর চঞ্চলতায় জাগিয়া উঠিতেছে। ... অশ্লীলতা, কদর্য ভাষা, ভাব নিতাইয়ের অজানা নয়। কিন্তু জীবনে সামান্য শিক্ষা এবং কবিয়ালির চর্চা করিয়া সে-সব এতদিন সে ভুলিতে চাহিয়াছিল। সে-সবের উপর একটা অরুচি, একটা ঘৃণা তাহার জন্মিয়াছিল। কিন্তু আজ বসন্তের কাছে আঘাত খাইয়া সেই আঘাতে ক্ষোভে নির্জলা মদ গিলিয়া সে উন্মত্ত হইয়া গেল। মদের নেশার মধ্যে দুরন্ত ক্ষোভে অর্জন-করা সব কিছুকে ভুলিয়া সে উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিল জান্তব অশ্লীলতাকে।

তারাশঙ্করের 'অশ্লীল' বিষয়ে এই অবস্থান আমরা আগেই দেখেছি। এটা অপরিচিত কিছুও নয়। ঔপনিবেশিক পুঁজির জন্মের গোটা সময়টা, যখন একই সঙ্গে তৈরি হয়ে চলেছে মুৎসুদ্দি পুঁজি এবং ভদ্র মধ্যবিত্ত দালাল শ্রেণী, যাকে আমরা নবজাগরণ বলে ডাকি, যখন পুঁজির প্রয়োজনে আসছে প্রকৌশল, তার প্রয়োজনে আসছে নানা ধরনের বিজ্ঞান ও বিদ্যা, সেই গোটা সময়টারই একটা বড় চিহ্ন এই শ্লীলতাবোধ।

এই নিয়ে বহু আলোচনা বহু জায়গাতেই আছে। আমরা এর কিছুটা পেয়েছিলাম মুসলিম নিষেধের ধারাবাহিকতায়, আর কিছুটা ভিক্টোরিয় খ্রীস্টান অনুশাসন বোধ থেকে, যা প্রায় সরাসরি অনুদিত হয়েছিল তখনকার শহুরে বাঙালির সংস্কৃতিতে, তা নিয়ে কথা বলার জায়গা এটা নয়। কিন্তু এটা খেয়াল করুন যে, সেই অশ্লীলতা কী করে ফেরত এল নিতাইয়ের মধ্যে, তার ব্যাখ্যা যে ধরনের জাতি ও বংশধারার বোধ দিয়ে করছেন তারাশঙ্কর, তা প্রায় মেইন ক্যাম্ফ, "বীরবংশী বংশের রক্তের বর্বরত্বের মৃতপ্রায় বীজাণু"। মেইন ক্যাম্ফ ও মহাপ্রভু এই টানাপোড়েনটা কেবল একবারই ঘটেছে তা নয়। 'কবি' উপন্যাসে দেখবেন, বারবার এটা ফিরে ফিরে এসেছে তারাশঙ্করের নিতাইয়ের বংশধারার বীজ ব্যাখ্যায়। তাই "ভিন্ন জাত হয়ে জন্মালাম কেনে" এই প্রশ্নের মধ্যে প্রথমেই নিজের আবেগকে অনস্তিত্ব করে দেওয়া, এবং জাতের কাঠামোটাকে অবিকৃত ভাবে মেনে নেওয়া এটা কোনও সচেতন শৈল্পিক সৃষ্টি নাও হতে পারে, তার সময়ের দ্বন্দ্ব ও লড়াইকে বোঝাতে তারাশঙ্কর যা সচেতনে এনেছেন। তারাশঙ্করের নিজের মননের সন্তান নিতাই, সে তার এই লেখক পিতার কাছ থেকেও পেয়ে থাকতে পারে এই টানাপোড়েন। কিন্তু চলচ্চিত্র 'কবি' এর থেকে অনেকটা বেরিয়ে আসে। জাতপাতের চিহ্নগুলি যেখানেই এসেছে, যেমন ঝুমুরদলের প্রহরীর হাতে যখন রাজন খাবার দিতে যাচ্ছে, মাসির আঁতকে ওঠা ইত্যাদি, সেগুলি এত উচ্চারিত যে তার প্রতি কোনও গোপন সমর্থন দেবকী বসুর 'কবি' চলচ্চিত্রে আমি পাইনি।

344
00:34:46,200 --> 00:34:48,300
(Bhojpuri folk song.)|47|
She went to bring water.
345
00:34:48,400 --> 00:34:58,200
1, 2, 3 ...
From the cemented well
5, 6, 7,8, 9,10.
346
00:34:59,100 --> 00:35:22,100
From the cemented well.
All my friends left me, o lover.
Lift my pot and put the lid.
Now go back happily, o lover.

পানিয়াভরন গইলি ...
এক দো তিন ...
পাকওয়া ইনারওয়াসে ...
পাঁচ, ছে, সাত, আট, ন, দস।
পাকওয়া ইনারওয়াসে
সব সখি ছোড়াকে গেলাই হো সিপহিয়া।
আরে ঘালাওয়া উঠায়ে দেহু
মোহাওয়া মিলায়ে দেহু
খুশিমনসে চলা যাহু ঘর হো সিপহিয়া।

আগেই উল্লেখ করে নি, অনেকবার শোনার ও দেখার পরেও এই গানটা আমি নিজে নিজে উদ্ধার করতে পারিনি। আমি সাহায্য নিয়েছিলাম আমার কলেজেরই হিন্দী বিভাগের সহকর্মী রেখা সিং এবং সূরজ শাহের। এই অভিজ্ঞতাটাই আমার খুব নতুন লেগেছে, একটা বাংলা ফিল্মে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভোজপুরি গান, এবং যা গাওয়া হয়েছে বেশ যত্নে ও সঠিক উচ্চারণে, ওরা দুজনেই আমায় বলেছে। সংক্ষেপে অনুবাদটা এরকম: জল আনতে গেল (নারী), বাঁধানো পাকা ইঁদারা থেকে, সব সখি ছেড়ে গেল, ওহে

প্রেমিক। জলের ভাণ্ডটা তুলে দাও (মাথায়), তার ঢাকনাটাও দিয়ে দাও, খুশি মনে চলে যাও, ওহে প্রেমিক। ভোজপুরী লোকগীতিতে সিপহিয়া নাকি প্রেমিক, কেন, কী করে, কবে থেকে, এসব ওর আর আমায় বলেনি, কিন্তু আমি প্রচুর ঘাবড়েছি। ইংরেজ ফৌজে চলে যেত যে জঙ্গী প্রেমিক, তার জন্য গ্রামে রয়ে যাওয়া প্রেমিকা দুঃখ করত? কোন যুদ্ধ? সিপাহী বিদ্রোহ, নাকি মেসোপটেমিয়া যুদ্ধ? কে জানে? যাকগে, কলস মাথায় নারী, সে তার প্রেমিকের সাহায্য নিতে চায় – একটুও কি চেনা লাগছে? আমাদের ফিল্মের সঙ্গে সম্পৃক্ততা যদি ছেড়েও দিই, রাধাকৃষ্ণ আলোচনার সঙ্গে এটার দূরত্ব শুধু দুধ আর জল। আর রাধাদের গোয়ালা ঘরে কী হয় আমরা সবাই জানি, তারা দুধে জল মেশায় না, মেশায় জলে দুধ। জলের একটা যোগান খুব জরুরি থাকে। যাকগে, একটা আলোচনা থেকে এভাবেই গজিয়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে অন্য নানা আলোচনা। সেটা ছেড়ে দিয়ে এই চলচ্চিত্রের নিরিখে এই ভাষাগত ঘটনাটার গুরুত্বের কথায় আসি।

বালিয়ার প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা আমরা আগেই করেছি। সেখানেই আমরা উল্লেখ করেছিলাম এই গানটার কথা। এবার একটু মেলানো যাক একে উপন্যাসের ভাষাবিষয়ক সূত্রগুলির সঙ্গে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, প্রচুর বাঙলা সাহিত্যের পটভূমি পশ্চিমে বা অন্যত্র অবাঙলাভাষী এলাকায় হওয়া সত্ত্বেও, সেখানকার জীবন ভাষা ইত্যাদি অত্যন্ত অপ্রতুল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বা শরদিন্দুর কিছু লেখা বাদ দিলে। কিন্তু মহাশ্বেতার জাতকে যেমন, বা শরদিন্দুতেও, ওই ভিন্নতাটাই সেখানে বক্তব্য বস্তু। ভিন্নতা যেখানে উপপাদ্য নয়, সেখানেও, স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার জীবন বা ভাষা লেখায় এসে যাওয়ার একটা উদাহরণ আছে 'কবি' উপন্যাসে। কাশী গেল নিতাই, সেখানকার বাস্তবতা ও ভাষা তার কাছে পৌঁছল একদম প্রথম সাক্ষাতেই, হিন্দি ও বাংলা যেখানে পাশাপাশি।

> ব্রিজের উপর ট্রেনের জানালা দিয়া কাশীর দিকে চাহিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঁকা চাঁদের ফালির মত গঙ্গার সাদা জল ঝকঝক করিতেছে–সমস্ত কোল জুড়িয়া মন্দির, মন্দির আর ঘাট, আরও কত বড় বড় বাড়ী। নিতাইয়ের মনে হইল মা গঙ্গা যেন চোখঝলসানো পাকা বাড়ীর কণ্ঠি গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছেন। ট্রেনের যাত্রীরা কলরব তুলিতেছে–জয় বাবা বিশ্বনাথ–অন্নপূর্ণামায়ী কি জয়।

বা, তার একটু পরেই,

> ... বাংলাদেশের শেষ হইতেই সে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। ট্রেনে ক্রমশই ভিন্ন-ভাষাভাষী ভিন্ন বেশভূষায় ভূষিত লোকের ভিড় বাড়িতেছিল।

ভাষার ও রকমের এই ভিন্নতাটা নিতাইয়ের চোখে পড়ছে। যা পুরনো বাঙলা সাহিত্যে খুব বহুল নয় আদৌ, আমরা আগেই বলেছি। যেমন আমরা আগেই বলেছি, অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির সামনে এসেই একটা জাতি-পরিচিতি বা আইডেন্টিটি নিজেকে নিজে বলে চিনতে পারে, তার খুব চমৎকার উদাহরণ আছে 'কবি' উপন্যাসেই, যখন এক ভাষাগোষ্ঠী অন্য এক ভাষাগোষ্ঠীকে, তার ভাষাকে, বুঝতে চেষ্টা করে। একদিন নিতাই গঙ্গার পাড়ে গেল। বসে বসে গান গাইছিল।

> গান শেষ হইলে–অল্প কয়েকজন লোক, যাহারা শেষে আসিয়া জমিয়াছিল–তাহাদের একজন তাহাকে কিছু বলিল–তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই সবিনয়ে বলিল–কি বললেন প্রভু? আমি বুঝতে পারতা নাই।
> একজন হাসিয়া বাংলায় বলিল–তুমি সবে এসেছ দেশ থেকে?
> –আজ্ঞে হ্যাঁ।
> –উনি বলছেন হিন্দী ভজন গাইতে। তোমার এমন মিষ্টি গলা, তোমার কাছে হিন্দী ভজন শুনতে চাইছেন।
> –হিন্দী ভজন? নিতাই জোড়হাতে বিনয় করিয়া বলিল–আজ্ঞে প্রভু, আমি তো হিন্দী ভজন জানি না।

> বাঙ্গালীটি হিন্দী-ভাষী প্রশ্নকারী লোকটিকে যাহা বলিল, আন্দাজে নিতাই সেটা বুঝিল; বোধ হয় বলিল–হিন্দী ভজন ও জানে না।
> জনতার অধিকাংশই এবার চলিয়া গেল। যেন তাহার মধ্যে উপেক্ষা ছিল বলিয়া নিতাইয়ের মনে হইল।

এই হিন্দি ভজনকে ঘিরে নিতাইয়ের প্রতিক্রিয়াটা ছিলই। সেটা নিয়েই সে শুয়েছিল গভীর রাতে গঙ্গার পাড়ে।

> চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল ঘাটের নীচে গঙ্গাস্রোতের নিম্ন কলস্বর ধ্বনিত হইতেছে। সেই শব্দই সে শুনিতে লাগিল। অপরিচয়ের পীড়ায় পীড়িত অস্বচ্ছন্দ তাহার মন অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল–গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুনিতে শুনিতেও নিতাইয়ের মনে হইল–গঙ্গাও যেন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছে। কাটোয়ায়, নবদ্বীপেও তো সে গঙ্গার শব্দ শুনিয়াছে; কাটোয়ায়, যে দিন বসন্তর দেহ পোড়াইয়াছিল, সে দিন তো গঙ্গা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিয়াছিল। এখানকার সবই কি দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কয়? ...
> অকস্মাৎ তাহার মনে হইল–বিশ্বনাথ? বিশ্বনাথই তো যে এই রাজ্যের রাজা; তবে তিনিও কি–এই দেশেরই ভাষা বলেন? তাঁহার এই ভক্তদের মতই তবে কি তিনি তাহার কথা–তাহার বন্দনা বুঝিতে পারেন না? হিন্দী ভজন? হিন্দী ভজনেই কি তিনি বেশী খুশী হন? 'মা অন্নপূর্ণা'–তিনিও কি হিন্দী বলেন? ক্ষুধার সময় তিনি যদি নিতাইকে প্রশ্ন করেন–তবে কি ওই হিন্দীতে কথা বলিবেন? তবে? তবে? তবে সে কাহাকে গান শুনাইবে?

হিন্দি আর বাংলা এই দুই ভাষা বর্গের মাধ্যমিক আন্তঃবর্গ ভূমিটাকে চিহ্নিত করছে নিতাই, বারবার। 'কবি' উপন্যাসে এটা ঘটছে চণ্ডীতলা গ্রামে নয়, কাশীতে গিয়ে। আর 'কবি' চলচ্চিত্র সেটাকে নিয়ে এসেছে চণ্ডীতলা রেল ইস্টিশনে। সেখানে বালিয়া আছে, যে তার বাচনে ('লাই হো মত' গালাগাল হিসাবে বেশ দড়, আমি দুচারবার লোকজনকে দিয়েও দেখেছি) ও সাঙ্গীতিক প্রতিভায় ওই একই বাস্তবতাকে খুলে দিচ্ছে নিতাইয়ের সামনে। কাশীতে ঘটমান বর্গসঙ্করতা এসে পৌঁছে গেছে চণ্ডীতলায়, রেলের দাক্ষিণ্যে, পুঁজি ও প্রকৌশলের আধুনিকতায়। ভোজপুরি লোকগীতি এসে পৌঁছে যাচ্ছে কবিগানের একই ভূমিতে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিথস্ক্রিয়া ঘটেই চলেছে, বিভিন্ন বর্গ ও তাদের পরিচিতিকে নিয়ে। এটাই রাজনের মেসোপটেমিয়া যুদ্ধ ও রেলের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট। খেয়াল রাখবেন, ব্রিটিশের এই মধ্যপ্রাচ্য অধিকার, তাকে কেন্দ্র করেই এল রেল ও মিলিটারি, সেখানেই এক মার্শালের সঙ্গে, না না ছি ইনি কোনও যুদ্ধের মার্শাল নন, একটি বাঙালি রাখাল বালক মিলে, ইনিও সত্যি সত্যি গরু চরাতেন না, আবিষ্কার করে ফেলল ঋগ্বেদের হরয়ূপিয়া। আমরা আমাদের অতীতকে জানলাম, যা আর্যদের বহু আগে থেকে শুরু। 'কবি' চলচ্চিত্রের এই বিরাট মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটটা এসে গেছে রেলের বাস্তবতাকে এই ভাবে গেঁথে ফেলায়, কবিয়ালের সাংস্কৃতিক পটভূমির সঙ্গে। এর ভ্রূণ বা ইশারাটুকু মাত্র ছিল 'কবি' উপন্যাসে, চলচ্চিত্র এই সম্ভাবনাটাকে বিস্ফোরিত করে দিয়েছে।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে নেটে এখন তোলা হয়েছে পুরনো অনেক বাংলা ও অন্যান্য পত্রিকার আর্কাইভ (http://www.savifa.uni-hd.de/thematicportals/periodicals/overview.html)। ১৮৬৭ সালের, বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৪, 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ৪৫ নম্বর সংখ্যায়, বেথুনের সাহায্যে স্থাপিত নিবাঁধই বালিকা বিদ্যালয়ের একটি আট বছরের বাচ্চা মেয়ের তিনটি প্রশ্নের উত্তর ও একটি রচনা তুলে দিয়ে 'স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি' নামে একটা লেখা ছাপা হয়েছিল। আমার পড়তে গিয়ে কেমন গা ছমছম করছিল। তখন, মাস চারেক আগে, 'কবি' ফিল্মের ইংরিজি সাবটাইটল করায় হাত দিয়েছি। সেটাও মাথায় একটা পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে কাজ করছিল। এই বাচ্চা মেয়েটির উত্তরগুলিতে একাধিক বার করে এসেছে দুটো জায়গা। এক, সীতার পতিনিষ্ঠা।

> রাম কর্ত্তৃক সীতা এত কষ্টে পতিতা হইয়াও ভ্রমে কখন রামের অমঙ্গল চিন্তা করেন নাই, ইহার দ্বারা সীতার পতি পরায়ণতার একশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ ঈদৃশ নির্ম্মল প্রেম সংসারে অতি দুর্ল্লভ।

দুই, জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে কুসংস্কার ভাঙা।

> যে মনুষ্য বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা জ্ঞান ধর্ম্মে আত্মার উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান হয়, এবং মৃত্যুকে উপস্থিত জানিয়া ও ঈশ্বরকে লক্ষ্য জানিয়া জ্ঞানাস্ত্র অবলম্বন করত সংসারের মোহরাশিকে জয় করিয়া জনসমাজে উন্নতিসাধন করণানন্তর ইহলোক হইতে অবসৃত হয় সেই প্রকৃত মনুষ্য নামের উপযুক্ত। ... কুসংস্কারাপন্ন স্বদেশস্থ ভ্রাতা ভগ্নীগণের হৃদয়ে সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবার জন্য যিনি চিরজীবনের স্বাস্থ্যরূপ অমূল্য রত্নকে বিসর্জ্জন দিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে ও সময় বিশেষে ধর্ম্মার্থে জীবন পরিত্যাগেও কাতর হয়েন না;

'সত্যধর্ম্ম' এই শব্দটায় নিশ্চিত ভাবেই মিশনারি উপস্থিতি আছে। খেয়াল রাখবেন নিবাঁধই বালিকা বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল বেথুনের হাতে। এটা যদি ছেড়েও দিই, অবশ্যই যে লিখছে, যে তাকে শেখাচ্ছে সেই শিক্ষক যার প্রচুর প্রশংসা আছে লেখাটিতে, এবং এই গোটাটা নিয়ে যে প্রতিবেদন লিখছে, এদের কারুর কাছেই উপরের এই দুটো জায়গার মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। রামের প্রতি সীতার নিষ্ঠা এবং কুসংস্কার মোচনে জ্ঞানধর্ম এই দুটোকে এক সঙ্গে বয়ে নিয়ে শিক্ষিত হচ্ছে যে মেয়েটি, ১৮৬৭ সালে তার বয়স ছিল আট। তার মানে, ১৯১৫ সালে যখন মেসোপটেমিয়া যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, তার বয়স তখন ছাপ্পান্ন। তার যদি ১৬ বয়সে বিয়ে ও ১৮-য় ছেলে হয়ে থাকে, তাহলে ছেলে জন্মেছে ১৮৭৭-এ, যার কুড়িতে ছেলে হয়ে থাকলে, ১৯১৫ সালে তার বয়স ১৮। তার মানে সে মেসোপটেমিয়া যুদ্ধে গিয়েই থাকতে পারে। যে পরিবারে শিক্ষার শুরু তার ঠাকুমা থেকে, সে নিশ্চিত ভাবেই জওয়ান বা কুলি হতে পারে না। আমাদের ওই ছবিতে যে ভারতীয় সহকারীরা রয়েছে সাহেব অফিসারের পাশে, তাদেরই কেউ সে হতেই পারে। যুদ্ধফেরত সে নিশ্চিত ভাবেই বাবু হয়েছিল, তাকেই কি আমরা দেখেছিলাম কবির লড়াইয়ের সভায়? শৃঙখলার প্রতি তার যেরূপ নিষ্ঠা তাদৃশ দৃষ্টে, এবং মেরুদণ্ড খাড়া করে তার বসার ভঙ্গীতে, এটাই মনে হয় যে তার কোনও ফৌজি ইতিহাস থাকলেও থাকতে পারে। উনি চরিত্রও বটে, আবার, যেমন আগেই বললাম, ছুটির দিন দুপুরে কাজ না থাকলে উনি পাঠকও বটে। হয়ত বাংলা উপন্যাস পড়ে তার অন্দরমহল এবং চাকরবাকরেরাই, কিন্তু যে পাঠক মাথায় রেখে তারাশঙ্কর লিখতেন, তিনি তাদেরই একজন। বাবু বিপ্রদাসকে মনে করুন, হেভি পড়তেন, তার লাইব্রেরিতে বন্দনা খেই হারিয়ে ফেলছিল প্রায়।

উল্টোদিকে আমাদের রাজনকে ভাবুন। মুচি ঘরের ছেলে রাজন যদি ১৯৩৮ সালে (যে বছর উপন্যাস লেখা হচ্ছে) আটত্রিশ বয়স্ক বলে ধরে নিই, তাহলে ১৯১৫ সালে মেসোপটেমিয়া। তারপর? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই, ১৯২০ সালে শুরু হল, তখনকার ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশে, মার্শাল-রাখালের খোঁড়াখুড়ি। তার আগেই, ব্রিটিশ রেলের লাইন পাততে গিয়ে কুলিরা টেনে আনছিল রাশি রাশি ইঁট, সেগুলোর বিশেষত্ব একটাই, হুবহু একই মাপের সেই ইঁটগুলো জন্মেছিল যীশুর জন্মেরও কয়েক হাজার বছর আগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ, রাজন, কুলি হিসাবে কাজ করে থাকতেই পারে সেখানে, চণ্ডীতলা ইস্টিশনে তার হোম-পোস্টিং-এর অনেকটা আগে। এই দুটো প্রবাহকে খেয়াল করুন। কুসংস্কার-বিরোধী নিষ্ঠাবান সীতাকে নিয়ে বাবুসমাজের জমকালো পিতৃতন্ত্র। আর এর বিপরীতে, নিরন্তর পিতৃতন্ত্র থেকে পিছলে যেতে থাকা রাজনদের নিতাইদের বাস্তবতা। তারা কুলি হিসাবে কী টেনে আনছে পিঠে, পাঁচ হাজার বছরের নাকি পাঁচ মাসের ইঁট, তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। ব্রিটিশ রেলের হাত ধরে প্রকৌশল, প্রকৌশলের সঙ্গে বিজ্ঞান ও তাড়ির দোকান, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ থেকে প্রদেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে বালিয়ারা। একটা বড় সংখ্যক এসেছে সেই বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকেই, যা আধুনিক ভারতের জন্ম দিয়েছিল, তার খনিজে আর খনিজে। গাঙ্গেয় উপত্যকার অতটা অরণ্য উপড়ে আর্যরা ঢুকে এসেছিলই তো ওই বিহারের পাটনা বা পাটলিপুত্রের

জন্যে, যেখানে লৌহ আকরিক আছে।

অন্য কথায় চলে যাচ্ছি, 'কবি'-তে ফেরা যাক। কুসংস্কারমুক্ত সীতা থেকে ন্যাশনাল সোশালিস্ট মহান্ত – পিতৃতন্ত্র এভাবেই দিন কাটাচ্ছিল। এর মাঝখানে বাড়তে শুরু করল মুচি রাজন ডোম নিতাই আর ভোজপুরী মজুর বালিয়ার বাস্তবতা। 'কবি' চলচ্চিত্রের জোরটা এইখানে যে সে এই অন্য বাস্তবতাটাকে নিয়ে এল সেই একই পিতৃতন্ত্রের কাছে। দর্শক তো সে-ই যে তারাশঙ্করের পাঠক ছিল, কিন্তু দর্শনীয় গেল নড়ে। যতটা নড়ার সম্ভাবনা ছিল উপন্যাস 'কবি'-তে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি করে। তারাশঙ্করের অন্তর্বিরোধ, তাঁর লেখাতেই মহান্তের যে নীল চশমার কথা পেলাম, সেই নীল চশমা দিয়ে তিনি যে নিজেই দেখছেন, তাঁর শিল্পীসত্তার সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারের পরও, তার অবস্থানই তার চোখে ওই চশমাটা গুঁজে দেয়, এই জায়গাটাই আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'কবি' চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে। লেখাটা এবার ক্রমে গুটিয়ে আসছে। চলচ্চিত্রে আমরা পৌঁছেছি পঁয়ত্রিশ মিনিটের কিছু বেশি, তার মানে মোট দৈর্ঘের এক তৃতীয়াংশেরও কম। এখনও পরপর দৃশ্য ধরে, উপাদানগুলোকে পরপর স্পষ্টতায় নিয়ে আসাই যায়। কিন্তু কোনও নতুনতর দৃষ্টিকোণ নয়, তা হবে এতক্ষণ ধরে তুলে আনা দৃষ্টিকোণগুলো দিয়েই বারবার আলাদা আলাদা উপাদানকে দেখানো। এবার সেটা আপনারা নিজেরাই করুন। আমি এই লেখাটা শুরু করেছিলাম, দেবাশিসের মত আমার ছাত্রস্থানীয় কারুর কারুর জন্যে, কেন 'কবি' চলচ্চিত্রটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝাতে, ওই নানা সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণগুলো সামনে ধরে দিতে। সেগুলো বোধহয় পৌঁছে গেছে। ফিল্মে এর পরই এল নিতাইয়ের নিমন্ত্রণ, মহাদেব কবিয়ালের কাছ থেকে, দিনপ্রতি ছটাকা বায়নায়। টাকাটার বাজারদর বুঝতে, মনে করুন, মেলায় এসে যে মালাটা দর করেছিল ঠাকুরঝি, সেটার দাম ছিল ছয় পয়সা। অর্থনৈতিক রকমে সেই স্বীকৃতি এসে পৌঁছতে শুরু করল, যেটা এতক্ষণ আমরা সাংস্কৃতিক রকমে দেখছিলাম।

আগে যদি নিজে থেকে নাও পড়ে থাকে, এতক্ষণের আলোচনার পর, এবার আপনাদের নিজেদের চোখেই পড়ে যাবে ঠাকুরঝির ব্যক্তি আবেগের সেই মহাকাব্যিক মুহূর্তটা। নিতাই ঠাকুরঝিকে বলেছিল, পরে যেদিন আসবে চণ্ডীতলা গ্রামে সেদিন ঠাকুরঝি যেন নিতাইয়ের দেওয়া মালাটা ফেরত নিয়ে আসে। রাজন আর তার বৌয়ের কথোপকথন থেকে নিতাই জানতে পেরেছিল, মালাটার সূত্রে গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে ঠাকুরঝিকে, ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভেবেছে ও দুধের পয়সা চুরি করে কিনেছে মালাটা। ঠাকুরঝি জানত না নিতাই এটা জানে, এবং নিতাইকে সে এই অত্যাচারের বৃত্তান্ত বলার দরকারও মনে করল না, যখন নিতাইকে সে জানাল, নিতাইয়ের দেওয়া মালাটা তার সঙ্গেই থাকে, এবং সেটা সে দেবে না। সে চিতায় উঠলে নিতাই যেন খুলে নেয়। এটা সেই একই আত্মবিশ্বাস, "আমার মন" বলায় যেটা উচ্চারিত হয়েছিল। এই নারীকে 'কবি' চলচ্চিত্র ছাড়া আর কোন রূপারোপে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। এবং এটা কোনও ভুঁইফোড় আত্মবিশ্বাস নয়। ঠাকুরঝির বাস্তবতায় বহু অত্যাচারই চিত্রিত হয়েছে, এটা হল অত্যাচারিতের আত্মবিশ্বাস, সে জানে দুচারটে অত্যাচার বেশি বা কমে তার কিছু এসে যাবে না। সে ঠিক সয়ে যেতে পারবে। এটা কোনও রোমান্টিকতা নয়, একদম রক্তমাংসের আত্মবিশ্বাস। স্পার্টাকাস তার সঙ্গীদের যা বলেছিল, তার সঙ্গে বেশ যেতে পারে এটা। হেগেল তার ফেনোমেনোলজি অফ স্পিরিটে দাসের যে আত্মবীক্ষার কথা বলেছিলেন।

আপনাদের চোখে পড়বে দু-দুবার বসন, একটি নারী, দুটি আলাদা আলাদা পুরুষকে চড় মারছে। সত্যি সত্যিই পর্দায় দেখানো হবে সেই দুটি চড়ই। এবং এর একবার, পুরো আলোয়, একটি চড় মারার পর, আর একটি মারার জন্যে উদ্যত হাতে অপেক্ষা করছে বসন, সেটাও দেখানো হবে। নারী আদুরে আব্দেরে হাতে চড় মারছে, বুকে কিল মারছে, এ রুটিন ভুলে যান, এটা সত্য সত্যই চড়, ব্যথা দেওয়ার জন্যে মারা। এই চিত্রনও আমি আর কোথাও দেখেছি বলে তো মনে করতে পারছি না। এই বসনের সঙ্গে নিতাইয়ের সম্পর্কের মধ্যে দেখতে পাবেন, দুটি ডিসকোর্সের বা আলোচনার, বৈষ্ণব এবং শাক্ত, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা। সাক্ষর বসনের বৈষ্ণব পদাবলীর খাতার সঙ্গে আদানপ্রদানে আসছে নিতাই। দুজনের দুটি রকম,

একটি অন্যটির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে। দেখবেন, পুরুষ নিতাইয়ের রূপের প্রশংসা করছে ঠাকুরঝি। ইত্যাদি।

যে অর্থনৈতিক স্বীকৃতি আসছে এর পরেই, মহাদেব কবিয়ালের নিমন্ত্রণে, সেটা ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। নিতাই যোগ দিল ঝুমুরদলে। সেখানে যোগ দেওয়ার পর, শিল্পের শুদ্ধসত্তা সংক্রান্ত নিতাইয়ের ধারণা, আর বাণিজ্যীকরণের ভিতরকার লড়াই, সে খেউড় গাইবে কিনা, গাইতে পারবে কিনা, গাইতে গেলে তাকে মদ খেতে হয় কিনা, এই সমস্ত প্রশ্ন আসতে দেখবেন। এবং দেখবেন, প্রথমে ডোম হিসাবে, এবং পরে, কবিয়াল হিসাবে, ঝুমুরদলের বেশ্যাদের সঙ্গে থাকা কবিয়াল বলে, নিতাই সবসময়েই কেমন উচ্চবর্গ থেকে পিছলে যাচ্ছে, হয়ে উঠেও হয়ে উঠতে পারছে না। এটাও কবি চলচ্চিত্রের নিজস্ব। নিতাইয়ের উচ্চবর্গীকরণকে এমন ঝুলিয়ে রাখা। বর্গীকরণটা যেখানে শুধুই পৃথক এবং স্থগিত হয়ে যাচ্ছে, নিতাইয়ের অনায়াস আয়ত্তে আসছে না কিছুতেই। এখানেও ঔপনিবেশিক পুঁজির সমাজে একটি পরাধীন ভাষার ও সংস্কৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন জড়িয়ে যেতে থাকবে নিতাইয়ের চলচ্চিত্রায়নে। প্রচুর এই বর্গসঙ্করতা সংক্রান্ত উপাদানও আসবে। শুধু আগের আলোচনা মাথায় রেখে চলচ্চিত্রের পরবর্তী অংশটা দেখুন। আমার ধারণা, আমার বক্তব্যের মূল প্রতিটি গতিই আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছে। এবার আমার কাজটা আপনার, যদি এই কাজটা পছন্দ হয়ে থাকে আদৌ।